শ্রাবণ সন্ধ্যাটুকু

ইমদাদুল হক মিলন

www.BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এ এক বেদনাদায়ক ঘটনা।

দুপুরবেলা নাইতে গিয়ে রব বয়াতির বাঁহাতের কড়ে আঙুলটা কাটা পড়ে পদ্মার ঘোলাজলে হারিয়ে গেল। সেই আঙুল আর খুঁজেই পাওয়া গেল না। বয়াতির ছোটমেয়ে পারুল নদীতে নেমে দিশেহারা ভঙ্গিতে বাবার আঙুল খুঁজছিল আর হায় হায় করছিল। যেন বহু মূল্যবান এক সম্পদ হারিয়ে গেছে তাদের। কাটা আঙুল খুঁজে পেলেই বা কী লাভ তা সে জানে না। বিয়ের উপযুক্ত মেয়ে কিন্তু পারুলের বুদ্ধিসুদ্ধি ভালো না। অল্পতেই দিশেহারা হয়।

বয়াতিকে তখন ধরাধরি করে পারে তোলা হয়েছে। জ্ঞান নেই। কাটা পড়া আঙুলের গোড়া থেকে বলক দিয়ে বেরুচ্ছে রক্ত। বয়াতির বউ হাজেরা পুরনো একখানা গামছা দিয়ে চেপে ধরে রেখেছে জায়গাটা। পারুলের মতো হায় হায় সে করছে না কিন্তু বিলাপ করছে। এইডা কী হইলো গো? আল্লাহ গো!

বয়াতির দশাসই শরীর পড়ে আছে নদীতীরের বেলেমাটিতে। সাদালুঙ্গি ভিজে লেপটে আছে শরীরে। মাথার কালো তেলতেলে বাবরি বেয়ে টপটপ করে পড়ছে পানি। মুখের কালো ঘন দাড়িমোচ বেয়ে পড়ছে পানি। চোখ উল্টে বয়াতি তখন যায় যায়।

পাড়ায় ততক্ষণে বিরাট হৈচৈ। তালুকদারদের নদীতীরের পতিত জমি ভাড়া নিয়েছে রব বয়াতির মতো চল্লিশঘর নদীভাঙা মানুষ। গায়ে গা লাগানো ছাপড়াঘর তুলে সেখানে তারা থাকে। বছরভাড়া দশহাজার। চল্লিশটি পরিবার যার ভাগে যা পড়ে সে অনুযায়ী টাকা দিয়ে বসবাস করছে. রব বয়াতি হচ্ছে তাদের মাথা। টাকা সে-ই তোলে, সে-ই ওসমান গনি তালুকদারের ঢাকার অফিসে গিয়ে গুনে গুনে টাকাটা দিয়ে আসে।

সেই রব বয়াতির আঙুল কাটা পড়েছে!

মুহূর্তে চল্লিশঘর লোক এক। যে যেভাবে পারে দৌড়াদৌড়ি ছুটাছুটি শুরু করল। বয়াতিকে ধরাধরি করে নিয়ে যাওয়া হলো কুমারভোগ বাজারে। সেখানে বড়সড় ওষুধের দোকান পরেশ ডাক্তারের। তিনি দোকানেই ছিলেন। পুরনো আমলের এল এম এফ ডাক্তার। চোখে মোটা কাঁচের চশমা। ধুতি-পাঞ্জাবি পরা বয়স্ক মানুষটি বয়াতির কাটাপড়া আঙুলের গোড়ার দিকটা দেখে চিন্তিত হয়ে গেলেন। হাড়ের একটুখানি কোণা উঁচু হয়ে আছে। গোড়া থেকে কেটে বাদ দিতে হবে।

এই কাজ করার যন্ত্র পরেশ ডাক্তারের নেই। এনেসথেসিয়া দেয়াও তার পক্ষে সম্ভব না। ব্যথা কমাবার একটা ইনজেশান দিয়ে তিনি বললেন, মুন্সিগঞ্জ হাসপাতালে নিয়ে যাও। ওখানে না নিলে অসুবিধা আছে। দেশ গ্রামে এই জিনিসের চিকিৎসা হবে না।

বয়াতির বড়মেয়ে শেফালি থাকে এই গ্রামেই। তবে শ্বশুরবাড়ি। জামাই বদরু লেপতোষকের দোকানদারি করে গোয়ালিমান্দ্রা। ততক্ষণে মেয়ে জামাই সবাই এসে হাজির। কীভাবে মুন্সিগঞ্জ নেয়া হবে ওসবের বুদ্ধি-পরামর্শ চলছে। বয়াতির ঘরে টাকা-পয়সা কিছু আছে। ওই নিয়ে রওনা দেয়া যায়।

বয়াতি গান-বাজনার লোক ঠিকই কিন্তু এটা তার পেশা না। সে করে মাছের কারবার। অতি ছোট সাইজের মাছের কারবার। হাজার চার-পাঁচেক টাকা পুঁজি। ওই নিয়ে ভোররাতে উঠে কোনোদিন ট্রলারে করে চলে যায় হাঁসাইল বাজারে, কোনোদিন পায়ে হেঁটে আর নয়তো রিকশা নিয়ে যায় মাওয়ার ঘাটে। চার-পাঁচহাজার টাকার মাছ পাইকারি দরে কিনে কুমারভোগ বাজারে, শিমুলিয়া কিংবা হলদিয়া বাজারে বসে খুচরা বিক্রি করে। দু'আড়াইশো, তিনশো টাকার কাজ হয়।

কোনো কোনোদিন মাওয়ার মাছঘাটা থেকে পাইকারি দরে মাছ কিনে মাওয়ার বাজারে বসেই খুচরা দরে বিক্রি করে।

মাওয়ার মাছ আসে যশোর খুলনা সাতক্ষীরার ওদিক থেকে। ঘেরের মাছ। ময়মনসিংহের ভালুকা ওসব দিক থেকে ট্রাকে ট্রাকে আসে চাষের পাঙাস। রুই কাতলা তেলাপিয়া, সিলভারকাপ। হাঁসাইল বাজারে পাওয়া যায় পদ্মার মাছ। বর্ষাকালে পাওয়া যায় বিল পুকুরের মাছ। দু'জায়গার মাছ দু'রকম, কারবারও দুরকম। তবে আয়-রোজগার প্রায় একই রকম। বিশ-পঞ্চাশ টাকা এদিক আর ওদিক।

দুপুরের মুখে মুখেই বয়াতির দিনের কায়কারবার শেষ। ভোরবেলা উঠে কারবারে বেরোয়, লুঙ্গির কোচড়ে টাকার খুতি। ইঁসাইল গেলে ট্রলারে বিশমিনিট। আসতে যেতে ভাড়া পঞ্চাশ টাকা। মাছ কেনাবেচা করে, সংসারের বাজারটা করে দুপুরের মুখে মুখে বাড়ি ফেরে বয়াতি। তারপর আর কোনো কাজ নেই। বাড়ির সঙ্গে পদ্মা। পদ্মায় গিয়ে পাড়া-পড়শিদের সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্পগুজব, আড্ডা চাটামি, তারপর গোসল সেরে নিজের ছাপড়াঘরে

বয়াতির গোসলের সময় অনেকেই থাকে নদীর ঘাটে।

আজও ছিল।

লোকজন না থাকলে বিপদটা আরও বড়রকম হতে পারতো। আঙুল কাটা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান হয়ে গেছে সে। অজ্ঞান হয়ে পানিতে ডুবে গেলে মারাও পড়তে পারতো। লোকজন সঙ্গে সঙ্গে ধরাধরি করে পারে তুলেছে বলে রক্ষা।

ঘটনা হলো কী, আজ সকাল থেকে মনের মধ্যে একটা গান গুনগুন করছে বয়াতির।

গুরু গো, সুজন নাইয়া
ভবপারে লও আমারে বাইয়া।
আমার জীর্ণ তরী
নাই কাণ্ডারী,
হারে, তরী কে লবে আউগাইয়া।

সকালবেলা হাঁসাইল বাজারে রওনা দেয়ার সময় থেকেই এই গান মনে। বাড়ি থেকে বেরুবার সময়, ট্রলারে বসে, বাজারে মাছ কেনাবেচা করার ফাঁকে বারবারই এই গান গুনগুনিয়ে উঠেছে মনের ভিতর। ওই পাঁচটা লাইনই।

আজ কায়কারবার তেমন সুবিধার হয়নি। দুশো বিশ টাকার মতো কাজ হয়েছে। হোক। তাতে কী। কারবার তো এমনই। একদিন একটু বেশি, একদিন একটু কম। কোনো কোনোদিন দুচারশো লসও হয়। হতেই পারে!

কিচ্ছু করার নেই।

অন্যদিন হলে কম রোজগারের জন্য একটু হায় আপশোস হয়তো হতো বয়াতির। কারণ বড় জামাইটার কাছে একটু ঋণী আছে সে। বিয়েতে দুইভরি সোনা দেয়ার কথা ছিল। একভরি কোনো রকমে ম্যানেজ করেছিল। বলেছিল কিছুদিনের মধ্যেই আরেক ভরির ব্যবস্থা করবে। তারপর চার বছর কেটে গেছে। চার বছরে শেফালির এখন একছেলে একমেয়ে। কিন্তু ওই একভরি সোনা আর দেয়া হয়নি। এই নিয়ে মেয়েটাকে প্রায়ই খোটা দেয় জামাই। বাড়িতে এসে কান্নাকাটি করে শেফালি। চার বছর আগে সোনার দর ছিল নয়-দশ হাজার টাকা ভরি। এখন হয়েছে তেইশ-চব্বিশ হাজার। এত টাকা কোত্থেকে জোগাড় করবে বয়াতি। মেয়ের বিয়েই তো দিয়েছিল দেশ-গ্রামের লোকজনের সাহায্যে। নিজের কিছু ছিল। সঙ্গে তালুকদার সাব, বাসার সাব, আউয়াল সাব আর ঢাকা থেকে আজাদ মিলন সাব এইসব মানুষের টাকায় মেয়েটাকে পার করা গেছে। তারপরও ওই একভরির সমস্যা রয়ে গেছে।

এদিকে ছোট মেয়েটাও গেছে বিয়ের উপযুক্ত হয়ে।

এসব দিক দিয়ে বয়াতির মনে অশান্তির শেষ নেই। তবে গান মনে এলে, দোতরা নিয়ে বসলে জাগৎ-সংসারের কোনো কিছুই তার আর মাথায় থাকে না।

কিসের একভরি সোনা!
কিসের ছোটমেয়ের বিয়ে!

কিসের কায়কারবার, কিসের কী! তখন শুধু গান, তখন শুধু দোতরার টুংটাং।

হাঁসাইল বাজার থেকে ফেরার সময় আজ ট্রলারে বসে গানটার পরের তিনটা লাইন পেয়ে গেল রব বয়াতি।

এখন শ্রাবণ মাস। সকাল থেকে আকাশ মেঘলা ছিল, কিন্তু একফোঁটাও বৃষ্টি

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

হয়নি। দুপুরের দিকে বাঘের মতন রোদ উঠেছে। ট্রলারে বসে নদীর হাওয়ায় বেজায় গরম লাগছিল। রোদে খাখা করছে পদ্মা। নদী ছুঁয়ে আসা হাওয়ায়ও চুলার আগুনের মতো তাপ।

সেই তাপ গায়েই লাগল না বয়াতির। কারণ গানের পরের তিনটা লাইন মনে এসেছে। ট্রলারের ভট ভট শব্দ ছাপিয়ে বয়াতির মনের খুব ভিতরে ঢুকে গেল,

ভবনদীর অকূল পাথার,
আমি ত জানি না সাঁতার
ওগো, আমারে মাইরো না চুবাইয়া।

বাহ্ কী সুন্দর দাঁড়াচ্ছে গানখানা। বাড়ি গিয়েই গোসল খাওয়া সেরে দোতরা নিয়ে বসে যাবে বয়াতি। সুরটা তুলবে। আর সেই ফাঁকে যদি পাওয়া যায় আর দু'তিনটা লাইন।

গোসল করতে গিয়ে আরও তিনটা লাইন পেল বয়াতি।

ঘাটে শুকনো লুঙ্গি রেখে পরনের লুঙ্গি আর কাঁধে গামছা নিয়ে নদীতে নেমেছে। ঘাটে ছোট একটা ট্রলার বাঁধা। ট্রলারে কোনো লোক নেই। চল্লিশ ঘর নারীপুরুষ মিলে কয়েকজন নেমে ডুবোডুবি করছে শ্রাবণমাসের ভরা পদ্মায়। ওপার থেকে ভট ভট করে এপারের দিকে আসছে একটা ট্রলার। ওই ছোট সাইজেরই। এগুলো আসলে খেয়ানৌকা। লোকজন এপার-ওপার করে। আগে যেমন মাঝি মাল্লারা বৈঠা বেয়ে, কাঠের নৌকায় নদী পারাপার করতো, এখন এক প্রকারের লোহার নৌকায় ইঞ্জিন লাগিয়ে ট্রলার বানিয়েছে। ওতে সময়টা বাঁচে অনেক, শরীরের পরিশ্রমও বাঁচে। আবার টাকাটাও বেশি। ইঞ্জিনের নৌকা তো! তেল খরচা আছে না! আর স্টিলবডির দামও তো বেশি। কোথায় কাঠের নৌকা আর কোথায় স্টিলবডির ট্রলার। নৌকার মতো হলেই বা কী! জিনিসের তো ব্যাসকম আছে!

কোমর পানিতে নেমে আরও তিনটা লাইন বয়াতি পেল। কাঁধে পুরনো গামছা। বাঁহাতে খামছে ধরে আছে পারে লাগোয়া ট্রলারের একটা পাশ। মনের মধ্যে গুন গুনিয়ে উঠল,

তোমার নামেতে কলঙ্ক হবে,
গুরু গো, ভবপারের বন্ধু,
যদি মরি হাবুডুবু খাইয়া!

তারপরই ঘটে গেল আঙুলের ঘটনা।

ওপার থেকে আসা ট্রলারের মাথার দিকটা আচমকাই চেপে গেল পারে লেগে থাকা ট্রলারের ঠিক সেই জায়গাটায়, বয়াতি যে জায়গাটা খামছে ধরে গানের শেষ দিককার তিনটি লাইন গুনগুন করছে। ভাগ্যিস কড়ে আঙুলটা একটুখানি ছড়ানো ছিল, ফলে ওটার ওপর দিয়েই গেল আঘাত। আল্লা'র অশেষ রহমত, কাণ্ড যা হলো, বয়াতির চারটে আঙুলই চলে যাওয়ার কথা। আর যদি তার দেহটা পড়তো দুই ট্রলারের মাঝখানে তাহলে চাপা খেয়ে ভবলীলাই সাঙ্গ হয়ে যেত। কপালগুণে বেঁচে গেল সে। দিতে হলো শুধু কড়ে আঙুলটা।

পরেশ ডাক্তারের দোকানে তখন ছুটতে ছুটতে এসেছে শুভ।

সে তালুকদার বাড়ির ছেলে। খুবই পরোপকারি ধরনের। এলাকার মানুষের যে-কোনো বিপদ-আপদে শুভকে পাওয়া যাবেই। লৌহজং কলেজ থেকে বিএ পাস করে সে এখন বেকার। জনসেবা ছাড়া আর কিছুই করে না। খুবই নরম মনের, বিনয়ী ধরনের ছেলে। বেশ লম্বা, বেশ সুন্দর দেখতে। টকটকে ফর্সা গায়ের রঙ। স্বাস্থ্য ভালো। মাথায় ঘন ঝাঁকড়া চুল। টকটকে সুন্দর মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। সব মিলিয়ে দেবদূতের মতো এক যুবক।

শুভর পরনে আজ ফেডেড জিনসের প্যান্ট আর সাদা টিশার্ট। পায়ে স্যান্ডেল সু। সবকিছুই বেশ পুরনো। তবু তাকে দারুণ লাগছে।

সে এসে বয়াতির অবস্থা দেখে ভড়কে গেল। ততক্ষণে বয়াতির জ্ঞান ফিরেছে। কিন্তু গভীর যন্ত্রণায় গোঙাচ্ছে। কালো মুখখানা আরও কালো হয়ে গেছে। পরেশ ডাক্তার তাড়া দিচ্ছেন। তাড়াতাড়ি মুন্সিগঞ্জ নিয়ে যাও। দেরি করো না। দেরি করলে বিপদ।

বয়াতির বউ আর দুইমেয়ে, মেয়ের জামাই, চল্লিশ ঘরের আরও অনেক ঘরের লোকজন সবাই অস্থির। শুভকে দেখে বেশ ভরসা পেল তারা। পরেশ ডাক্তার বললেন, টাকা-পয়সা সঙ্গে নিও টাকা-পয়সা লাগবে।

হাজেরা পাগলের মতো ছুটে গেল বাড়িতে। বয়াতির মাছের কারবারের টাকা-পয়সার খুতিটা নিয়ে এলো। ততক্ষণে একটা স্কুটার ঠিক করা হয়েছে সরাসরি মুন্সিগঞ্জ হাসপাতাল পর্যন্ত। টাকার খুতিটা কোমরে গুঁজে নিয়েছে পারুল। শেফালি যেতে পারছে না তার বাচ্চাদের জন্য। সে গেলে দুধের বাচ্চা কে দেখবে! হাজেরা যাবে না, সে গিয়ে কিছু করতে পারবে না বলে। ভয় পাবে, কান্নাকাটি করবে।

তাহলে বয়াতিকে নিয়ে মুন্সিগঞ্জে এখন যাবে কে?

শুধু পারুল?

পারুল দেখতে শুনতে বড়, স্বাস্থ্যবতী। সবই ঠিক আছে কিন্তু বুদ্ধিসুদ্ধি তো তেমন না

পারুল তার বাপকে খুবই ভালোবাসে। বাপের জন্য দরদের সীমা-পরিসীমা নেই। বাপের সঙ্গে সে যাবেই। বাপের এই বিপদে সে না গিয়ে পারে না।

শেষ পর্যন্ত সাব্যস্ত হলো শেফালির জামাই বদরু আর পারুল যাবে। স্কুটার ঠিক হয়েছে আড়াইশো টাকায়। অচেতন বয়াতিকে মাঝখানে বসিয়ে, একপাশে পারুল আরেক পাশে বদরু স্কুটারে উঠে বসেছে। পারুল সেই পুরনো গামছা দিয়ে বয়াতির কাটাপড়া আঙুলের জায়গাটা চেপে রেখেছে। ব্যথা কমানের ইনজেকশান পরেশ ডাক্তার দিয়েছেন, ঠিকই তাতে ব্যথা বিন্দুমাত্র কমেছে বলে মনে হয় না। বয়াতির গোঙানি চলছেই। চোখ উল্টে আছে।

শুভ এতক্ষণ ধরে সবার সঙ্গে মিলেমিশে বয়াতির তদারক করেছে। বদরু-পারুল ওদের মাঝখানে বয়াতিকে তুলেও দিয়েছে। মেয়ের কাঁধে মাথা রেখে সমানে গোঙাচ্ছে বয়াতি। আর পারুল বিলাপের মতো করে বলছে, হায় হায়, আমার বাবায় অহন দোতারা ধরবো কেমনে? দোতারা বাজাইবো কেমনে? মাছ ধরবো কেমনে? কায়কারবার করবো কেমনে? হায় হায়! আমরা তো অহন না খাইয়া মরুম।

শুভ তাকে একটা ধমক দিল। এই তুই চুপ কর।

তারপর স্কুটারঅলাকে তাড়া দিল। তাড়াতাড়ি চলেন ভাই, তাড়াতাড়ি চলেন।

তখনও পর্যন্ত কেউ ভাবেনি শুভ নিজেও বয়াতির সঙ্গে মুন্সিগঞ্জ হাসপাতালে যাবে। স্কুটার স্টার্ট দেয়ার পর শুভ যখন ড্রাইভারের পাশে বসে পড়ল তখন সবার মুখে বেশ একটা স্বস্তিরভাব। এই একটা কাজের কাজ হলো। শুভভাই গেছে। এখন বয়াতির আর কোনো অসুবিধা হবে না।

লোকজনের আন্দাজই ঠিক।

অসুবিধা বয়াতির হলোও না। মুন্সিগঞ্জ হাসপাতালের ডাক্তার-নার্স অনেকেই শুভর পরিচিত। হাসপাতালের সামনে স্কুটার থামার পর দৌড়ে গিয়ে একটা স্ট্রেচার নিয়ে এলো শুভ। সঙ্গে দুজন ওয়ার্ডবয়। বয়াতিকে ধরাধরি করে স্ট্রেচারে তুলল তারা। দ্রুত নিয়ে ঢুকে গেল ইমারজেন্সি ওয়ার্ডে। সেখানে অল্পবয়সি দুতিনজন ডাক্তার। তাদের যিনি সিনিয়র, ডক্টর আলতাফ, সে শুভর বিশেষ পরিচিত। ভাগ্যিস তিনি ছিলেন। বয়াতির অবস্থা দেখে তখনই ওটিতে নিয়ে গেলেন। কড়ে আঙুলের জয়েন্টের কাছটায় একটুখানি হাড় রয়ে গেছে। অপারেশান করে ওইটুকু ফেলে দিতে হবে।

শুনেই ভয় পেয়ে গেল পারুল। প্রায় কেঁদে ফেলে ফেলে অবস্থা। হায় হায়, বাবারে অপরেশান করবো? হায় হায়।

শুভ আবার তাকে সেই ধমকটা দিল। এই তুই চুপ কর।

শেফালির জামাই বদরুর মুখটাও শুকনা। অপারেশানের কথা শুনে সেও ভয় পেয়েছে কিন্তু উচ্চবাচ্য কিছু করেনি।

বয়াতি গোঙাতে গোঙাতে বলল, অপরেশন লাগবোনি? হায় হায় কয় কী?

অর্থাৎ সেও ভয় পেয়েছে।

ডাক্তার-নার্সরা খুবই প্রবোধ দিল তাকে। আপনি টেরও পাবেন না কীভাবে কী হবে? শুধু বাঁহাতের কব্জি থেকে

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

এনেসথেসিয়া দেব। সাহস থাকলে আপনি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতেও পারেন। তবে ব্যথা বলতে কিছু থাকবে না। কিছুই টের পাবেন না।

শুভও বুঝালো তাকে। সে বয়াতিকে ডাকে 'বয়াতি মামা'। বলল, তুমি কিছু টের পাবে না বয়াতি মামা। অপারেশান না করালে বিপদ আছে। আমি আছি তোমার সঙ্গে। ভয় পেও না।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে কাজ-কারবার শেষ। হাড়ের গোড়াটুকু ফেলে দিয়ে সেলাই ব্যান্ডেজ ইনজেকসান ইত্যাদি দিয়ে ওয়ার্ডে আনা হলো বয়াতিকে। তখন সে অনেকটাই আরাম পাচ্ছে। মুখে স্বস্তির একটা ভাব। বদরু আর পারুল আছে পাশে। শুভও আছে।

হাসপাতালে বয়াতিকে থাকতে হবে তিনদিন। দিন দশ-পনেরো পরে, ঘা পুরোপুরি শুকালে সেলাই কাটাতে হবে। তার আগে তিনচারদিন পর পর এসে ড্রেসিং করিয়ে যেতে হবে। সব মিলিয়ে ভালো রকম একটা খরচা আছে। হাজার বিশেক টাকা লেগে যাবে।

শুনে বয়াতির কালো মুখ আরও কালো হয়ে গেল।

সাড়ে পাঁচহাজার টাকা খুতিতে ছিল। পারুল সেটা বের করে দিল শুভর হাতে। হাসপাতালের একাউন্টে পাঁচহাজার টাকা জমা করিয়ে দিল শুভ। এই তিনদিন বদরু থাকবে শ্বশুরের কাছে। খুচরা পাঁচশো টাকা বদরুকে দিতে চাইল শুভ। এই টাকাটা তোমার কাছে রাখো।

বদরু বলল, কিসের জইন্য ?

তুমি তিনদিন থাকবে, খাওয়া দাওয়ার খরচা আছে। টুকটাক টাকা পয়সা তো কিছু লাগবোই।

বদরু হাসল। আমার কাছে টাকা আছে। আড়াই তিনহাজার টাকা আমি নিয়া আসছি। আমারে নিয়া আপনে চিন্তা কইরেন না। বেবিট্যাক্সির ভাড়াও আমি আমার পকেট থিকা দিছি।

তাই নাকি ?

হ। আপনে খেয়াল করেন নাই।

সত্যি তাই। স্কুটার ভাড়াটা যে বদরু দিয়েছে শুভ তা খেয়ালই করেনি।

বাকি পাঁচশো টাকা পারুলের হাতে দিল শুভ। রাখ তোর কাছে।

বদরু বলল, হ বেবিট্যাক্সি ভাড়াই তো লাগবো নে আড়াইশো টাকা।

না না এখন আর বেবিট্যাক্সিতে যাব না। বাসে চলে যাব। বাসভাড়া আমি দিয়ে দেব।

বয়াতি ততক্ষণে হাসপাতালের বিছানায় নাক ডাকিয়ে ঘুমাচ্ছে। দুপুর থেকে এতবড় ধকল! সব কাটিয়ে এখন নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছে সে। অপারেশানের জায়গা থেকে এখনও কাটে নি এনেসথেসিয়ার কার্যকারিতা। জায়গাটা অবশ হয়ে আছে। ফলে ব্যথা টের পাওয়া যাচ্ছে না।

শুভ তারপর পারুলকে নিয়ে হাসপাতাল থেকে বেরিয়েছে।

ততক্ষণে বিকেল হয়ে গেছে। আকাশ আর মেঘলা হয়নি। চমৎকার রোদ চারদিকে। বেশ গরম লাগছে। সেই গরমে পারুলকে নিয়ে মাওয়ার দিককার বাসে চড়েছে শুভ। দুজনের বাসভাড়া নিজের পকেট থেকে দিয়েছে।

তালুকদাররা বিরাট বড়লোক।

বাড়িতে কাঠের দোতলা একটা ঘরই তুলেছে পঁয়ষট্টি লাখ টাকা খরচা করে। সে এক দেখার মতো ঘর। বাড়িটা হবে বিশ-বাইশ কানী জমির ওপর। পুকুর বাগান মিলিয়ে এলাহি কাণ্ড। বাড়িতে উঠোন বলতে কিছু নেই, বিশাল একখানা মাঠ আছে। দোতলা ঘরটা মাওয়া লৌহজং রাস্তার পাশে। রাস্তার সঙ্গে লেকের মতো লম্বা ধরনের একটা পুকুর। পুকুরের ওপারে বাগান। গাছপালা ফুলের ঝাড়ের পর ছবির মতো কাঠের দোতলা ঘরখানা। রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় লোকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে

ঘরের পশ্চিম দিককার অনেকখানি জায়গা ছাড়িয়ে বাড়িতে ঢোকার পথ। ওসমান গনি তালুকদার আর তাঁর ভাই বেরাদররা সবাই ঢাকায়। মাসে পনেরো দিনে ছুটি ছাটার দিনে কেউ কেউ বেড়াতে আসেন। হয়তো বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় এলেন। শুক্রবারটা পুরো আর শনিবারের বিকেল পর্যন্ত থেকে আবার চলে গেলেন। বাড়ির কেয়ারটেকার হিসাবে আছে তালুকদারদের বহু দূর সম্পর্কের লতায় পাতায় আত্মীয় শুভ আর তার বিধবা ফুফু কদম নামে একজন গোমস্তাও আছে। সে পদ্মার ওপারকার চরের লোক। চরের নাম মাতবরের চর। বউ বাচ্চাকাচ্চা চরের বাড়িতেই থাকে। একমেয়ে আর তিনছেলে কদমের। মেয়ে বড়। তার বিয়ে হয়ে গেছে। থাকে ঢাকার কেরানীগঞ্জে। জামাই গার্মেন্টেসের রিজেকটেড মাল বিক্রি করে। তিনটি নাতি-নাতনি কদমের। মেয়ের নাম আসমান। জামাই আর তিনবাচ্চা নিয়ে সুখেই আছে আসমান।

মেয়ের পর, পর পর তিনছেলে। বড়ছেলের নাম চান, মেজোটা তারা আর ছোটটা সুরুজ। চান-তারা দু'জনেই বিয়ে করে ফেলেছে। সুরুজ এখনও করেনি। করবো করবো ভাব। তিনছেলেকে চরের লঞ্চঘাটে একটা চায়ের দোকান করে দিয়েছে কদম। তিনভাই পালা করে দোকান চালায়। সেই দোকানের আয়ে আর কদমের বেতনের কিছু টাকায় চরের সংসার মন্দ চলে না। কদম বেতন পায় আঠারোশো টাকা। শ' আটেক নিজের খরচ, বাকিটা পাঠায় বউকে। চায়ের দোকানের আয়ের সঙ্গে ওই একহাজার মিলিয়ে সংসারের চেহারা ভালোই কদমের। বউর বয়স হয়েছে। সুতরাং স্বামীর তেমন দরকার নেই তার। এই কারণে বছর ছয়মাসে এক দুবার বাড়ি যায় কদম। তাও তেমন দরকার না পড়লে যায় না।

সব মিলিয়ে তালুকদার বাড়ির গোমস্তা কদমের জীবন বেশ পরিচ্ছন্ন। ঝুট ঝামেলা বলতে গেলে নেই।

কিন্তু শুভর জীবনের গল্পটা অন্যরকম।

লোকে জানে তালুকদার বাড়ির ছেলে, আসলে সে তালুকদার বাড়ির ছেলে না। তালুকদাররা এত এত টাকার মালিক, কিন্তু শুভর পকেটে টাকাই থাকে না। তার আর ফুফুর খাওয়া খরচের টাকা দেয় তালুকদাররা। হাত খরচের জন্য ফুফুকেও কিছু টাকা দেয় মাসে। দুই ঈদে জামা কাপড় ইত্যাদি ইত্যাদি দেয়। ওদিক দিয়ে কোথাও কোনো সমস্যা নেই। শুভ যতদিন পড়াশুনা করেছে তার পড়াশুনার খরচাও দিয়েছে। ফুফুর কাছ থেকে অতি দরকারে পঞ্চাশ একশো টাকা হাত খরচের জন্য নেয়ও শুভ। তালুকদাররা তাকে ঢাকায় নিয়ে নিজেদের কোম্পানিতেই চাকরি-বাকরি দিতে চায়। শুভ যায় না। শুভর ওই এক কথা, ঢাকায় গেলে ফুফুকেও সে নিয়ে যাবে। ফুফুকে ছেড়ে সে থাকতে পারে না, ফুফুও পারে না তাকে ছেড়ে থাকতে। অন্যদিকে ফুফুর আবার ঢাকার শহর ভালো লাগে না। তিনি গ্রাম ছেড়ে যাবেন না। সুতরাং এ এক বড় সমস্যা।

তারপরও শুভ যে খারাপ আছে, তা না। আছে গভীর আনন্দেই। নিজের মতো চলছে ফিরছে, জনসেবা করছে। সিগ্রেট ফিগ্রেটের বদঅভ্যাস নেই। চা-ও তেমন খায় না। তবু বাড়তি হাত খরচের জন্য, এই যেমন এখন মুন্সিগঞ্জ থেকে কুমারভোগ পর্যন্ত দুজন মানুষের বাসভাড়া দেবে, এইসব খরচের জন্য দুটো টিউশনী করে। কাজির পাগলা হাইস্কুলের ক্লাস এইটের ছাত্রী মিষ্টিকে পড়ায়। মিষ্টিদের বাড়ি কুমারভোগেই। আরেকটা টিউশনি কালিরখিলের ওদিকে। সেটা একটা ত্যাদর ধরনের ছাত্র। পড়ে ক্লাস সেভেনে। নাম হচ্ছে মন্টু।

দুই দুটি টিউশনি মিলেও এমন কিছু টাকা না। অতি অল্পই।

বিক্রমপুর বড়লোকদের এলাকা। বড়লোকরা সব ঢাকায় থাকে। দেশগ্রামে পড়ে আছে যারা তারা গরিব মানুষ। টিউশনি মাস্টারকে আর কয়টা টাকা দিতে পারে তারা।

তবু টিউশনি দুটো করে শুভ। যা পাওয়া যায় আর কী!

বাসে বসে এসব ভাবতে ভাবতে এসেছে শুভ। কুমারভোগ আসতে আসতে সন্ধ্যা। বাড়ি এসে দেখে আরেক কাণ্ড। বাড়িতে ম্যালা অতিথি। কাঠের দোতলা ঘরটার প্রতিটি রুমে ঝকঝকে আলো

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

জ্বলছে। লোকজনের কথাবার্তা হাসাহাসি শোনা যাচ্ছে।

কারা এলো হঠাৎ করে ?

তালুকদাররা কেউ এলে তো এভাবে আসবে না। খবরাখবর দিয়ে আসবে। কদমের মোবাইলে ফোন করবে আর নয়তো শুভর মোবাইলে ফোন করবে। রান্নাবান্নার আয়োজন করতে বলবে। কতজন আসবে, ক'দিন থাকবে, কী বিত্তান্ত সবই বলে কয়ে করেন তাঁরা।

তাঁরা এলে তো ফুফু শুভকে বলতেন!

তাহলে কারা এলো বাড়িতে ?

২

মিষ্টি কুমড়ার মোটা ফালির মতো চাঁদ উঠেছে।

শ্রাবণ সন্ধ্যার আকাশ বেশ পরিষ্কার। মেঘের চিহ্নমাত্র নেই। ফলে ওইটুকু চাঁদের আলোই মোলায়েম ভঙ্গিতে পড়েছে চারদিকে। তালুকদার বাড়ির কাঠের দোতলায় ঝকঝকে আলো জ্বলছে। চারদিককার বারান্দায়, উঠোনের দিকে আলো জ্বলছে। শুভ আর তার ফুফু যে লম্বা মতন একতলা দালানটায় থাকে, সেই দালানে অনেকগুলো রুম। বিশাল রান্নাঘর, খাওয়ার ঘর। খাওয়ার ঘরে বারোজন মানুষ একসঙ্গে বসে খেতে পারে এতবড় ডাইনিংটেবিল।

ওদিকটায় সাধারণত একটা লাইট জ্বলে। মানে উঠোনের দিককার লাইটটা জ্বলে। আর জ্বলে ফুফুর রুমের লাইট, শুভর রুমের লাইট। কদমেরটা তো জ্বলেই। তবে কদমের লাইটটা একটু বেশিরাত পর্যন্তই জ্বলে। কখনও কখনও রাত জেগে বাড়ি পাহারা দেয় সে।

আজ ওই দিককার প্রায় সবরুমেই লাইট জ্বলছে।

ঘটনা কী ?

কারা এলো এমন হঠাৎ করে ?

উঠোনের দিকে আসতেই কদমের সঙ্গে দেখা। বিশাল এক ট্রেতে চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে কাঠের দোতলা ঘরটির দিকে যাচ্ছে। সেই ঘরের নিচতলার ড্রয়িংরুমে বেশ ক'জন মানুষের কথাবার্তা, হাসাহাসির শব্দ বাড়ি ঢুকতে ঢুকতেই পেয়েছে শুভ। এখনও পেল। দুটি নারীকণ্ঠও আছে।

শুভকে দেখে থেমেছে কদম। তুমি ছিলা কোথায় ?

মুন্সিগঞ্জে গিয়েছিলাম।

বুজছি বুজছি। বয়াতিরে লইয়া গেছিলা।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

বয়াতির অবস্থা কী ?

সবই বলল শুভ।

কদম একটু রুক্ষ ধরনের মানুষ। এসবে তার তেমন কিছুই যায় আসে না। বাঁহাতের কড়ে আঙুল কেন, বয়াতির পুরো হাত কাটা পড়লেও সে তেমন কিছু ভাবতো না। সব শুনে শুধু বলল, ও।

শুভ বলল, কিন্তু বাড়ির খবর কী ? কারা আসছে ?

আর কইয়ো না। সাহেবের বন্ধুর ফিমিলি।

হঠাৎ ?

আরে মিয়া হঠাৎ না। দুপরেই বেগম সাবে আমারে ফোনে জানাইছে।

দুপুরে জানিয়েছে আর তারা এলো কখন ? বিকালে ?

তাহলে কি হঠাৎ হলো না ?

এক অর্থে হঠাৎই। তয় বড়লোক গো কায়কারবার তো এমুনই। আমারে ফোন কইরা বেগম সাবে কইলো, তোমার সাহেব তো দেশে নাই কদম। সে গেছে সিঙ্গাপুর। বিজনিসের কাজেই গেছে। দুই সপ্তাহ পর ফিরবো।

এটা আমি জানি।

কদম যেন একটু বিরক্ত হলো। জানলে আমারে আবার এতকথা জিগাইতাছো ক্যান ? যাও, গিয়া ফুবুর আঁচলের নিচে বইয়া থাকো।

www.BanglaBook.org

কদমকে শুভ ডাকে মামু। কদমও তাকে ডাকে মামু।

কদম মামু যে এরকমই এটা সে জানে। এজন্য কিছুই মনে করল না। হাসিমুখে বলল, রাগ করো ক্যান মামু ? আমি কী রাগের কথা বললাম ?

কদম সঙ্গে সঙ্গে ঠান্ডা। শুভকে সে খুবই ভালোবাসে। নরম গলায় বলল, এরা বিরক্ত একটু বেশি করতাছে। এইজন্য মিজাজটা খারাপ।

কী রকম বিরক্ত ?

আগে চা দিয়া আসি তারবাদে তোমারে কমু নে।

কদম দ্রুত হেঁটে দোতলা ঘরের দিকে চলে গেল।

শুভ তারপর ফুফুর রুমে এসে ঢুকল। ফুফু রুমে নেই। রান্নাঘরের দিকে তাঁর গলার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। আরেকজন মহিলার সঙ্গে টুকটাক কথা বলছেন। শুভ বুঝে গেল মহিলাটি হচ্ছে বোচার মা। বয়াতি পাড়ার মানুষ। রান্না করে অসাধারণ। এই বাড়িতে অতিথি এলে তাকে ডেকে আনা হয় রান্নার জন্য। একবেলার রান্নায় খাওয়া ছাড়া নগদ টাকা দিতে হয় একশো। তালুকদাররা এসে দুচারদিন থাকলে বোচার মার রোজগার ভালো। সকালের নাশতাসহ তিনবেলার রান্নাই করে। তালুকদাররা চারদিন থাকলে তিন চারে বারোশো টাকা ইনকাম বোচার মার।

আজও সেই হিসেবেই আনা হয়েছে তাকে।

শুভ তারপর রান্নাঘরের দরজায় এসে দাঁড়াল।

হ্যাঁ, যা ভেবেছে তাই। রান্নাবান্নার ধুম লেগে গেছে। ইলিশ মাছ সবজি বেগুনভাজি ডাল, দুই চুলোয় সমানে চলছে রান্না। বোচার মা ব্যস্ত হাতে সব সামলাচ্ছে। ফুফু একটা জলচৌকি নিয়ে বসে আছেন সামনে।

শুভ ছেলেমানুষি কায়দায় পিছন থেকে গিয়ে ফুফুর চুল ধরে একটা টান দিল।

শুভর এইসব কায়দা ফুফুর মুখস্থ। মুখ ঘুরিয়ে শুভর দিকে তাকালেন তিনি। আপনে আছিলেন কই ? বয়াতির সেবাযত্ন ঠিকঠাক মতন হইছে ?

ফুফুর শ্লেষ গায়ে মাখলো না শুভ। হাসলো। ফুফুর সঙ্গে গলা মিলিয়ে তাঁর ভঙ্গিতেই বলল, জি হয়েছে আমি তাকে নিয়ে মুন্সিগঞ্জ হাসপাতালে গিয়েছিলাম।

সেইটা আমি বুজছি।

কিন্তু আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

এবার স্বাভাবিক হলেন ফুফু। তোর আবার বোঝনের কী আছে ?

বাড়িতে হঠাৎ কারা এলো ? কদম মামুর কাছে অবশ্য কিছুটা শুনেছি।

কী শুনছস ?

ওসমান গনি তালুকদারের সঙ্গে যত দূরের সম্পর্কই হোক সেই সম্পর্কে তিনি তার চাচা। তাঁকে সে ডাকে কাকা। সঙ্গতকারণে কাকার স্ত্রীকে ডাকে কাকি। বলল; কাকি দুপুরবেলা ফোন করে বলেছেন কাকার বন্ধুর ফ্যামিলি আসবে।

তয় তো শুনছসই। তারাই আসছে।

দুপুরবেলা ফোন আর বিকেলে এসে হাজির ?

হ।

তারপর তোমরা এতকিছু এরেঞ্জ করলে কী করে ?

বয়সে ছোট হলেও ওসমান গনি তালুকদারকে ফুফু ডাকেন দাদা। বললেন, গনি দাদার ড্রাইভারই তো সবাইরে পৌঁছাইয়া দিয়া গেল। ড্রাইভারের লগে ভাবিছাবে বিশ হাজার টাকা পাঠাইছে।

এত টাকা ক্যান ?

তারা থাকবো সাত আটদিন।

এতদিন ?

হ। মাংস টাংস খাইবো না। পোলাও বিরানি খাইবো না। খাইবো খালি ভাত আর মাছ। যত পদের মাছ খাইতে চায়, খাওয়াইতে হইব। বিক্রমপুরে আইজ কাইল মাছের দাম ঢাকার থিকা বেশি।

ফুফুর ভাষাটা খুব মজার। শুদ্ধর সঙ্গে বিক্রমপুরের মিশেল। তাঁর সঙ্গে কথা বলার সময় শুভও তাই করে। অন্য সময় সে কথা বলে একেবারেই শুদ্ধ ভাষায়।

তারা কয়জন আসছে ফুফু ?

চাইরজন। বাপ মা একটা মেয়ে আর মেয়ের সঙ্গে যে ছেলেটার বিয়া হইব, সে।

তাই নাকি ?

হ। তুই এত অবাক হইতাছস ক্যান ?

এখনও বিয়ে হয়নি তেমন জামাই নিয়ে বন্ধুর গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে চলে আসছে একটা ফ্যামিলি ? এটা তো অবাক হওয়ার মতোই ঘটনা।

বড়লোকগ কায়কারবার এই রকমই। তয় ছেলে বাংলাদেশের না।

শুভ অবাক। কোথাকার ?

আমরিকার। অর্থাৎ থাকে আমরিকায়। খাঙালি ছেলে।

তাই কও।

ফুফু আবার শুভর মুখের দিকে তাকালেন। সকালে নাস্তা করছেন, তারপর থিকা এই পর্যন্ত তো পেটে আর কিছু পড়ে নাই। নাকি পড়েছে ?

শুভ নির্বিকার গলায় বলল, না পড়ে নাই।

তয় অহন হাতমুখ ধুইয়া ভাতটা খাইয়া ল।

না খাইলেও অসুবিধা নাই।

ক্যান ? খিদা লাগে নাই ?

মনে হয় লাগছে।

ফুফু একটু রাগলেন। আমার লগে ফাইজলামি করিছ না শুভ। হাতমুখ ধুইয়া ভাত খা। তারবাদে তাগো লগে গিয়া দেখা কর।

আজ রাতেই দেখা করবো, নাকি কাল সকালে ?

এইটা কেমুন কথা হইল ? বাড়িতে মেহমান আসছে তুই তাগো লগে দেখা করবি না ? ভাবিছাবে আমারে বলছে শুভ য্যান তাগো দিকে খেয়াল রাখে।

আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে। তাহলে ভাত পরে খাই। আগে তাদের সঙ্গে দেখা করে আসি।

না।

ক্যান ?

মুখহাত ধুইয়া খাইয়া দাইয়া তারবাদে যা।

ক্যান, এখন অসুবিধা কী ?

এখন তোর চেহারা সুরত বান্দরের মতন হইয়া রইছে।

একথা শুনে বোচার মা পর্যন্ত হেসে ফেলল।

সেই হাসি গায়ে মাখলো না শুভ। বলল, আচ্ছা ঠিক আছে। তুমি খাবার রেডি করো, আমি বান্দর থেকে মানুষ হয়ে আসছি।

শুভ খেতে বসেছে, কদম এসে হাজির। তার হাতে সেই ট্রে আর চায়ের শূন্য সরঞ্জাম। ওসব জিনিস ডাইনিংটেবিলে নামিয়ে রাখতে রাখতে বলল, একবারেই কাজ সাইরা ফিরলাম।

শুভর খাওয়ার সময় ফুফু সামনে বসে থাকেন। এখনও আছেন। কদমের কথা শুনে বললেন, চা তুমি চাইলা দিছ ?

না।

তয় ?

তারা নিজেরা যে যার মতন চাইলা খাইছে।

শুভ বলল, আর তুমি ছিলা কোথায় ?

বারান্দায়। বারান্দায় বইসা ছিলাম। কখন কোন দরকারে ডাক দেয়!

বুঝেছি।

ফুফু বললেন, ভাত কখন খাইবো কিছু বলছে ?

বলছে। নয়টা সাড়ে নয়টার দিকে।

তয় ঠিক আছে। ততক্ষণে রান্নাবান্না হইয়া যাইবো।

শুভ বলল, কিন্তু মামু, দুপুরবেলা কাকির ফোন আর তারপর তুমি এতকিছু জোগাড় করলা কেমনে ? এত তাড়াতাড়ি ?

ডাইনিংটেবিলের একটা চেয়ারেই বসল কদম। সে খায় বগলা সিগ্রেট। ফুফুর সামনেই খায়। দীর্ঘদিন একসঙ্গে থাকলে বহুরকমের দূরত্বই মানুষের ঘুচে যায়। কদমেরও তাই হয়েছে। সে অনায়াসেই সিগ্রেট খায়, ফুফুও কিছু মনে করেন না। এক অর্থে ফুফু, শুভ আর কদম তিনজনের অবস্থা তো একরকমই। তিনজনই এই বাড়ির আশ্রিত। প্রকৃত অর্থে তালুকদারদের কর্মচারী। বাড়ির

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

কেয়ারটেকার।

কদম সিগ্রেট ধরালো। বড় করে একটা টান দিয়ে গভীর আনন্দে নাকমুখ দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলল, মাছের জন্য বিরাট দৌড়াদৌড়ি করতে হইছে।

কোথায় কোথায় গেলে ?

মাওয়ার বাজারেই পাইছি। তয় দাম নিছে অনেক। দুইখান ইলিশ ষোল্লোশো টাকা।

বলো কী ?

হ মিয়া। ষোল্লোশো টাকায় যে পাইছি, এইটা আমার কপাল। ওই সময় মাছই পাওনের কথা না।

তা ঠিক। তবে মামু কোনো কোনোদিন বিকেলে কিন্তু দুচারটা ইলিশ পাঙাস আইড় এসব মাছ ওঠে। বড় সাইজেরই। আমি দেখেছি।

হ ওঠে। কোনো কোনো জাউল্লা ওই রকম দুই চাইরটা মাছ পাইয়া যায়। আইজ ইলিশ দুইটা পাইছি পবনের কাছে। দাম বেশি, তয় মাছ তাজা।

ফুফু বললেন, হ, মাছ দুইটা ভালো।

শুভ বলল, এবার মামু আসল কথা বলো।

কদম সিগ্রেটে টান দিয়ে বলল, আসল কথা আবার কোনটা ?

যারা আসছে তাদের কথা।

ও। তারা হইল সাহেবের বন্ধু। ভদ্রলোকের নাম এনামুল হক।

গনি কাকার মতোই ব্যবসা করেন ?

ন। তার হইল গার্মেন্টেসের বিজনিস। বেগম সাব আমারে সব বলছেন। হক সাবের দুই মাইয়া। বড় মাইয়ার বিয়া হইয়া গেছে। সে থাকে কেনাডায়। ছোট মাইয়ারও বিয়া ঠিক। ছেলে থাকে আমরিকায়। সেই ছেলে দেশে আসছে। মাসখানেকের মধ্যে বিয়াশাদি হইয়া যাইবো।

বাকিটা আমি জানি। হবু মেয়ের জামাইকে নিয়ে ভদ্রলোক আমাদের এখানে কয়েকটা দিন কাটাবেন।

হ।

কদম সিগ্রেটে টান দিল। আমগ উপরে দিয়া কয়েকদিন আজাব যাইবো আর কী ?

কিসের আজাব ? এসবে তো আমরা অভ্যস্তই!

হ সেইটা ঠিক।

ফুফু আরেকটু ভাত তুলে দিতে চাইলেন শুভকে। শুভ হা হা করে উঠল। আর না, আর না। আর খেতে পারবো না।

সারাদিন খাছ নাই...

তার জন্য কী চার পাঁচ প্লেট ভাত খেতে হবে নাকি ? আমি এত খেতে পারি না।

খাওয়া শেষ করে উঠল শুভ।

এই বাড়ি একদম শহুরে কায়দার। বেসিন বাথরুম, জেনারেটার এসি, পানির পাম্প হাইকমোড বসানো টয়লেট সবই আছে। এমনিতে সবই বন্ধ থাকে। পল্লী বিদ্যুৎ ছাড়া আর কিছুই ব্যবহার করা হয় না। তালুকদার সাহেবরা এলে বা তাঁদের গেস্টরা এলে সবই চালু করা হয়। পাম্প চলিয়ে পানি তোলা হয় ট্যাংকে। পল্লী বিদ্যুৎ ফেইল করলে জেনারেটার চালানো হয়। গরমে এসি ফ্যান যেটা দরকার সেটাই চলে। বাথরুমের শাওয়ার ছেড়ে গোসল, বেসিনে হাতমুখ ধোয়া, মোটকথা সবকিছুই শহুরে। সবকিছুই বড়লোকি কায়দায়।

আজও তেমনই হচ্ছে।

এই সুযোগটা শুভও নিল। খাওয়া শেষ করে বেসিনে হাত ধুয়ে নিল।

ফুফু বললেন, এবার তাহলে যা।

কদম সিগ্রেট প্রায় শেষ করে এনেছে। বলল, কই যাইবো ?

ওই ঘরে একটু যাউক। মেহমানদের সঙ্গে একটু চিনা পরিচয় হোক।

হ হ সেইটা হওন উচিত। যাও মামু, যাও।

শুভর পরনে এখনও সেই আগের পোশাক। হাতমুখ ধুয়ে খাওয়া-দাওয়া করেছে। ফলে এখন তাকে আরও সতেজ আরও সজীব দেখাচ্ছে। তবু সে তার স্বভাব অনুযায়ী ফুফুর সঙ্গে একটু মজা করল। এই জামাকাপড়ে তাদের সামনে যাওয়া ঠিক হবে ফুফু ?

ফুফু অবাক। ক্যান, জামাকাপড়ের অসুবিধা কী ? ঠিকই তো আছে।

আর চেহারা ? মুখে একটু পাউডার মেখে নেব ?

এবার শুভর ফাজলামোটা ধরতে পারলেন ফুফু। হাসিমুখে বললেন, জুতার বাড়ি খাবি। যা তাড়াতাড়ি যা।

শুভ তারপর বেরুলো।

ওইটুকু চাঁদের আলো এখন যেন আর একটু প্রখর। তালুকদার বাড়ির গাছপালা পুকুর আর মাঠের মতো বিশাল উঠোনের সবুজ ঘাস চাঁদ আর পল্লী বিদ্যুতের আলোয় ফুটফুট করছে। হাওয়া বলতে একদমই নেই। কেমন একটা গুমোট গরম। তারপরও পরিবেশটা ভালো লাগল শুভর। এই পরিবেশ তার সব সময়ই প্রিয়। প্রিয় বলেই হয়তো এই বাড়ি ছেড়ে কোথাও যেতে চায় না সে। নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবে না। জীবন যেভাবে কাটছে কাটুক না। তার তো কোনো পিছুটান নেই।

দোতলা ঘরটির একতলা-দোতলা দুতলাতেই চারদিকে কাঠের রেলিং দেয়া চওড়া সুন্দর বারান্দা। উঠান থেকে চার ধাপ সিঁড়ি উঠে গেছে বারান্দায়। সিঁড়ি ভেঙে বারান্দায় উঠল শুভ। ড্রয়িংরুমের দরজায় এসে দাঁড়াল।

স্লামালেকুম।

ড্রয়িংরুমে বসা তিনজন মানুষ একসঙ্গে শুভর দিকে তাকালো।

এনাম সাহেব বসে আছেন দরজার মুখোমুখি সোফায়। সালামের জবাব তিনিই দিলেন। ওয়ালাইকুম সালাম। তুমিই তাহলে শুভ ?

জি। কিন্তু আপনি আমাকে কী করে চিনলেন ?

ভাবি, মানে তালুকদারের স্ত্রী আমাকে তোমার কথা বলেছেন।

তাই নাকি ?

হ্যাঁ এসো, ভিতরে এসো।

শুভ ভিতরে ঢুকল।

এনাম সাহেব বললেন, তুমি নিশ্চয় আমাদের সম্পর্কে শুনেছো ?

জি শুনেছি।

কিন্তু তুমি ছিলে কোথায় ? আমরা এলাম বিকেলবেলা আর এখন এতটা রাত হয়েছে!

বয়াতির ঘটনাটা সংক্ষেপে বলল শুভ। শুনে ভদ্রলোক খুশি হলেন। গুড, ভেরিগুড। মানুষের বিপদ-আপদে পাশে দাঁড়ানো ভালো। এসো, তোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেই। ওই উনি, বুঝতেই পারছো আমার স্ত্রী। আর এই যে ইয়াংম্যান, আমার ছোটমেয়ের হবু বর। ওদের পুরো ফ্যামিলি আমেরিকায় থাকে। ও যখন খুব ছোট, না মানে তেমন ছোট না, কিশোর, কিশোর বয়সে মা-বাবার সঙ্গে চলে গিয়েছিল। ফ্লোরিডায় থাকে। ফ্লোরিডার ওয়েস্ট পামবিচে বাড়ি। হি ইজ এ কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার। নাম হচ্ছে নাবিল।

এনামুল হক সাহেবকে বেশ প্রাণবন্ত ভদ্রলোক মনে হলো শুভর। পঁয়ষট্টি ছেষট্টি বছর হবে বয়স। মাথায় এখনও বেশ চুল। বেশির ভাগই সাদা। স্লিম ধরনের সুন্দর ফিগার। গায়ের রঙ ফর্সা, চেহারা সুন্দর। তাঁর তুলনায় স্ত্রী বেশ বুড়িয়েছেন। ভালো রকম মোটা তিনি। হয়তো মোটার কারণে বয়স যা তারচে' অনেক বেশি মনে হয়। গায়ের রঙ ধবধবে ফর্সা। মুখটা গোল। ভদ্রলোক যতটা প্রাণবন্ত, মহিলা ততটাই গম্ভীর প্রকৃতির। একটু বোধহয় দাম্ভিকও। শুভর দিকে এক দুবার তাকালেন ঠিকই, সেই তাকানোতে তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের ভাব।

টাকাঅলা লোকদের বেশির ভাগ স্ত্রীই এমন।

ব্যতিক্রম যে নেই তা না। যেমন গনি কাকার স্ত্রী, গনি কাকার বন্ধু বাসার কাকার স্ত্রী। তাঁরা তো বিশাল টাকা-পয়সার মালিক। এনাম সাহেবের চে' কয়েকগুণ বেশিই হবে তাঁদের টাকা। কিন্তু স্বামী-স্ত্রী সবারই ব্যবহার চমৎকার। মানুষকে অবজ্ঞা অবহেলা করতে শিখেন নি। সবার সঙ্গেই হাসিমুখে কথা বলেন।

শুভ তারপর নাবিলের দিকে তাকালো।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

শুভর মতোই হবে বয়স। মুখ আর শরীরের গঠন দেখলেই বোঝা যায় বড়লোকের ছেলে। ফর্সা গোলগাল চেহারা। মোটা ধাঁচের শরীর। মাথার সামনের দিক থেকে এই বয়সেই টাক পড়তে শুরু করেছে। মাথার ওপর বন বন করে ঘুরছে ফ্যান তারপরও নাকের তলায় ঘাম চিকচিক করছে।

মেয়েরা কেন যে এই ধরনের যুবকদের পছন্দ করে?

আমেরিকায় থাকে, এটাই কি কারণ?

নাকি উচ্চশিক্ষিত সেটা বড় কারণ?

নাকি এই ধরনের যুবকদের বিয়ে করলে সারাজীবন আমেরিকায় কাটাবার নিশ্চয়তা? গ্রীনকার্ড, তারপর আমেরিকান পাসপোর্ট!

এসবই কি কারণ?

শুভ তখনও দাঁড়িয়ে আছে। ভঙ্গিটা অতি বিনয়ী।

এনাম সাহেব বললেন, তুমি বসো না শুভ। বসো।

সোফায় না, শুভ বসল একটা চেয়ারে। এই ঘরের তিনদিকে সোফা, একদিকে কয়টা দামি চেয়ার। সেই চেয়ারের একটায় বসল সে

নাবিল ছেলেটা ভদ্রতার খাতিরেই যেন শুভকে জিজ্ঞেস করল, আপনি এ রকম গ্রামে, আই মিন এখানে পড়িয়া আছেন কেন?

শুভ জবাব দেয়ার আগেই এনাম সাহেব বললেন, শোনো শুভ, নাবিল কিন্তু বাংলা ভালো বলতে পারে না। ওই যে 'পড়িয়া' বলল। ওর বাংলা কিন্তু এ রকমই।

শুভ হাসল। আমি বুঝেছি।

তারপর নবিলের দিকে তাকালো। খুবই সহজ-সরল একটা জবাব দিল। আমার গ্রামই ভালো লাগে। কাল দিনেরবেলা আপনি গ্রামটা ঘুরে দেখবেন। অসাধারণ সুন্দর গ্রাম। এই বাড়ির দক্ষিণেই, মিনিট পাঁচেক হাঁটলে পদ্মানদী। নদীর তীরে গেলে আপনার খুব ভালো লাগবে।

এবার কথা বললেন ভদ্রমহিলা। আমরা সবই জানি। এজন্যই এখানে বেড়াতে এসেছি। কাল থেকে সব ঘুরে ঘুরে দেখবো।

এনাম সাহেব বললেন, তুমি হাঁটতে পারবে তো?

তা পারবো।

নাবিল?

নাবিল হাসলো। আমিও পারিবো আংকেল। নো প্রবলেম।

শুভ তখন আরেকজন মানুষের কথা ভাবছে। এনাম সাহেবের মেয়েটি কোথায়? সবাইকে দেখলাম, তাকে দেখছি না কেন?

শুভর মনের কথাটা যেন টের পেলেন এনাম সাহেব। হাসিমুখে বললেন, আমার মেয়েকে তুমি এখনও দেখোনি। সে বোধহয় ওয়াসরুমে। একটু বসো, এলেই পরিচয় করিয়ে দেব। আজই পরিচয় হয়ে যাওয়া ভালো। কারণ কাল থেকে তুমি তো আমাদের গাইড।

কথাটা বুঝতে পারল না শুভ। বলল, জি?

মানে আমাদেরকে ঘুরিয়ে টুরিয়ে সব দেখাবে। গ্রাম এলাকায় অবশ্য দেখার তেমন কিছু থাকে না। আমরা আসলে রেস্ট নেব। খাবো, গল্প করবো। একটু এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াবো। এই আসাটা হতো না। নাবিলের জন্য হলো। সে বাংলাদেশের কোনো গ্রাম দেখেনি। জন্মেছে ঢাকায়। তারপর চলে গেছে আমেরিকায়। বাংলাদেশের গ্রাম দেখার খুব শখ। এজন্য তাকে নিয়ে এলাম।

এসময় ভিতর দিককার দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো একটি মেয়ে।

এনাম সাহেব উচ্ছ্বসিত গলায় বললেন, এই তো এসে গেছে। এই আমার মেয়ে মৌ।

মৌকে দেখে শুভ যেন নিজের অজান্তেই উঠে দাঁড়াল। অপলক চোখে মৌর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

এত সুন্দর মেয়ে সে জীবনে দেখে নি।

মৌর সঙ্গে কথা হলো পরদিন ভোরবেলা।

৩

শুভর অভ্যাস হচ্ছে ভোরবেলা ঘুম থেকে ওঠা।

একটু বেশি ভোরবেলাই। এই বাড়ির দক্ষিণ দিককার পুকুরের ওপারে খুব সুন্দর একখানা মসজিদ করেছেন গনি বাকা। একজন পরহেজগার ধরনের ইমাম সাহেব আছেন। তিনি থাকেন মসজিদের লাগোয়া একটা রুমে। বাড়ি থেকে তিনবেলা তাঁর খাবার দিয়ে আসে কদম। নোয়াখালির লোক। বেতন থাকা খাওয়া বাবদ আড়াই হাজার টাকা।

ইমাম সাহেব অতি ভালো মানুষ ধরনের। হালকা আকাশি রঙের লুঙ্গি আর সাদা পাঞ্জাবি পরে এদিক ওদিক কখনও কখনও ঘুরে বেড়ান। মাথায় গোল সাদাটুপি, হাতে তসবি। সারাক্ষণ তসবি জপেন। গা থেকে বেরোয় আতরের পবিত্র গন্ধ। চোখে সুরমা থাকে তাঁর। ঘরে আরবি বাংলা দুরকমের কোরানশরিফই আছে। প্রচুর হাদিসের বই। শুভ একদিন দেখেছে কলকাতার 'হরফ' প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত ভাই গিরিশচন্দ্র সেন অনূদিত 'কোরআন শারীফ' আছে। ঢাকার মাওলা ব্রাদার্স থেকে প্রকাশিত মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান অনূদিত 'কোরানশরিফ সরল বঙ্গানুবাদ' আছে।

ইমাম সাহেবই শুভকে একদিন দেখিয়েছিলেন কলকাতার 'হরফ' প্রকাশনীর বইটির প্রচ্ছদে লেখা 'কুরআন শারীফ' ভিতরের পাতায় লেখা 'কোরআন শারীফ'। বানানের সমতা নেই।

ভাই গিরিশচন্দ্র সেনই বাংলাভাষায় প্রথম কোরানশরিফ অনুবাদ করেন। একজন হিন্দু অনুবাদ করেছেন মুসলমান ধর্মের পবিত্রতম গ্রন্থ, এজন্য সেই সময়কার মুসলমানরা খুশি হয়ে তাঁকে 'ভাই' উপাধি দিয়েছিলেন। পঁচাশি বছর পর, ১৯৭৯ সালে এই পবিত্র গ্রন্থের পুনঃমুদ্রণ করেছেন হরফ প্রকাশনীর পক্ষে বেগম মারইয়াম।

ইমাম সাহেব বললেন, তিনি ভাই গিরিশচন্দ্রের অনুবাদও পড়েছেন মুহাম্মদ হাবিবুর রহমানের অনুবাদও পড়েছেন। তাঁর ভালো লেগেছে হাবিবুর রহমান সাহেবের অনুবাদ।

শুভ একটু অবাকই হয়েছিল।

সাধারণত ইমাম সাহেবরা বাংলা অনুবাদে কোরানশরিফ পড়েন না বা পড়তে চান না। এই ভদ্রলোক বেশ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়েছেন। আর চমৎকার একটা কথা বলেছিলেন। কোরানশরিফ পড়ার জন্য, বোঝার জন্য, নিজের জীবনকে কোরানের শিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য। কোরানের আলোয় জীবনের পথে চলার জন্য কেউ যদি তার নিজভাষায় কোরানশরিফ পড়ে সেই অনুযায়ী জীবনকে পরিচালিত করে, বা তাঁর যদি বুঝতে সুবিধা হয়, তবে তাই করা উচিত।

শুভ সেদিন থেকে ইমাম সাহেবের ভক্ত।

ইমাম সাহেবের ফজরের আজান শোনার সঙ্গে সঙ্গে তার ঘুম ভাঙে। কিন্তু তখনই ওঠে না। মিনিট পনেরো বিশেক দেরি করে। তারপর নিজের রুম থেকে যখন বেরোয়, দেখে ফুফু তাঁর রুমে বসে নামাজ পড়ছেন। তাঁর রুমের দরজা খোলা। আজানের সঙ্গে সঙ্গে উঠে অজু করতে বেরিয়েছিলেন।

এই পবিত্র দৃশ্য দেখে শুভর মন ভালো হয়ে যায়।

ঘর থেকে বেরিয়ে সবুজ ঘাসের মাঠ কিংবা উঠোনে আসার পর মনে লাগে অন্য রকমের একদোলা। চারদিকে পদ্মার ঘোলাজলের মতো আলো। গাছপালায় ডাকছে পাখিরা। ভোরের দোয়েল পাখিটা চড়তে নেমেছে ঘাসবনে। আর কী সুন্দর একটা হাওয়া আসছে নদীর দিক থেকে! মাথার ওপরকার আকাশ একটু একটু করে পরিষ্কার হচ্ছে। ফজরের নামাজ শেষ করে চারপাশের ধর্মপ্রাণ মানুষ বেরিয়েছেন মসজিদ থেকে। যে যার বাড়ির পথে পা বাড়িয়েছেন

শুভ তারপর দোতলা ঘরটির পুবদিককার পুকুরের দিকে পা বাড়ায়।

এত সুন্দর একটা ঘাটলা করা হয়েছে পুকুরটার। হালকা সবুজ ধরনের দামি পাথরের। ঘাটলার দুপাশে অনেক গাছপালা। পুকুরের টলটলে জলে রক্তশাপলা ফুটে থাকে। ঘাটলার বেঞ্চে গিয়ে বসলে এত ভালো লাগে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

এইসব ভালো লাগার কারণেই তো এইবাড়ি ছেড়ে কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না শুভর।

আজ ভোরবেলাও প্রতিদিনকার মতো শুভ এসে বসেছে ঘাটলার বেঞ্চে। তার পরনে হালকা আকাশি রঙের টাউজার্স আর সাদার ওপর সাদা কাজ করা পুরনো একটা পাঞ্জাবি। বেশ কুঁচকে আছে পাঞ্জাবিটা। কারণ এটা হচ্ছে তার 'ঘুমপোশাক'। এসব পরেই ঘুমিয়েছিল।

ঘুম বরাবরই খুব গভীর শুভর। শোয়ার এক দুমিনিটের মধ্যে ঘুম। সেই ঘুম সারারাতে আর ভাঙেই না। ফজরের আজানের সঙ্গে সঙ্গে ভাঙে। গভীর ঘুম ঘুমানো মানুষের মুখে এক ধরনের আলগা লাবণ্য খেলা করে। সকালবেলা সেই লাবণ্য আজ শুভর মুখে খেলা করছে।

কিন্তু শুভ একটু উদাস। কালরাতে মৌকে দেখার পর থেকে তার মনটা একটু অন্যরকম।

মানুষ এত সুন্দরও হয়!

দুর্ভাগ্য কয়েক পলকের বেশি তাকে দেখতে পায়নি শুভ। তখনই চলে গেল পল্লীবিদ্যুৎ। যে যার হাতের মোবাইল টিপে সামান্য একটু আলোকিত করল ঘর। শুভও তার মোবাইল টিপে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়েছিল। অসুবিধা নেই। এক্ষুনি জেনারেটার চালু করছি।

উঠোনে নেমে কদমকে ডাকতে যাবে, তার আগেই কদম তার স্বভাব মতো ছুটে গিয়ে জেনারেটার অন করেছে। আলোয় আলোয় আবার ভরে গেছে বাড়ি. কিন্তু শুভর আর ওই ঘরে ফেরা হয়নি, আর দেখা হয়নি মৌকে। ওই যে মৌকে দেখে উঠে দাঁড়ানো বা মুগ্ধ ভঙ্গিতে তাকিয়ে থাকা, এসবের জন্য একটু বেশ লজ্জাই লাগছিল। এমন কী তাদের খাওয়া-দাওয়ার সময়ও সামনে যায়নি। কদমই তদারক করছিল সব কিছুর।

আজ ভোরবেলা ঘাটলায় বসে এসবই কি ভাবছিল শুভ!

এসময় পিছন দিকে কার পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। শুভ একটু চমকালো। পিছন ফিরে তাকালো। তারপর কালরাতের মতোই নিজের অজান্তে উঠে দাঁড়াল। অপলক চোখে মানুষটির দিকে তাকিয়ে রইল।

মৌ!

মৌর পরনে হালকা গোলাপি রঙের সালোয়ার কামিজ। পায়ে ফ্ল্যাট টাইপ স্যান্ডেল। ঘুমভাঙা মুখ কালরাতের চেয়েও সুন্দর।

কয়েক পলক মৌকে দেখে উঠোনের দিকে পা বাড়াল শুভ।

মৌ বলল, আপনি যাচ্ছেন কেন?

না মানে আপনি বোধহয় এদিকটায় বসবেন!

মৌ হাসল। ঘাটলায় তো অনেক জায়গা। আমি বসলে আপনিও বসতে পারেন!

শুভও হাসল। জি তা পারি।

তাহলে?

না মানে আপনি সেটা পছন্দ করবেন কী না! আপনার মা বাবা, নাবিল সাহেব, তাঁরাও নিশ্চয় এখন আসবেন। আপনারা হয়তো এখানটায় বসে চা খাবেন...

আরে না! আমার মা বাবা উঠবেন সাড়ে আটটা ন'টার দিকে। নাবিল উঠবে এগারোটার দিকে।

তাই নাকি?

হ্যাঁ। ওদের এরকমই অভ্যাস। আমিও একটু বেলা করেই উঠি। মানে আজকাল উঠছি আর কী! আগে যখন ইউনিভার্সিটি ছিল...আমি পড়তাম নর্থসাউথ ইউনিভার্সিটিতে। আমার বিবিএ শেষ হয়েছে। ইন্টারনিও করে ফেলেছি। এমবিএ করবো আমেরিকায় গিয়ে। আমাদের নর্থসাউথের ক্লাস কোনো কোনোদিন সকাল আটটায়ও থাকতো। তখন খুব সকালে উঠতে হতো। আমার অভ্যাস হচ্ছে প্রায় সারারাত জেগে পড়া। যেদিন ওরকম আটটার ক্লাস থাকতো, সেই রাতে আমি আর ঘুমাতামই না। রাত জেগে পড়াশুনা শেষ করে একবারে সকালবেলা ইউনিভার্সিটিতে চলে যেতাম। বারোটার দিকে ফ্রি। তারপর বাড়ি এসে ঘুম। আবার যেদিন সকালবেলা ক্লাস নেই, ঘুম থেকে উঠলাম হয়তো এগারোটায়। ক্লাস হয়তো আড়াইটায় কিংবা তিনটায়। কোনো

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

কোনোদিন সন্ধ্যাবেলাও ক্লাস কিংবা পরীক্ষা থাকতো। হয়তো রাত ন'টা পর্যন্ত ইউনিভার্সিটিতে। আগে তো ইউনিভার্সিটিটা ছিল আমাদের বাড়ির কাছেই, বনানীতে। এখন ক্যাম্পাসটা চলে গেছে বসুন্ধরায়। ওদিকটায় যে কী জ্যাম লাগে! এক দেড়ঘণ্টা বসে থাকতে হয় রাস্তায়।

তারপরই হাসল মৌ। যেন নিজেকেই নিজে বলছে এমন গলায় বলল, আশ্চর্য!

শুভ বলল, কী?

আমি এত কথা কেন বলছি?

শুভ মুগ্ধ হয়ে মৌর কথা শুনছিল। সে দেখতে যত সুন্দর, কথাও বলে তত সুন্দর করে। কথা বলার সময় মুখটা হাসিহাসি আর চোখ যেন আনন্দে ফেটে পড়ে।

শুভ বলল, আমার শুনতে ভালোই লেগেছে।

তাই?

হ্যাঁ।

তাহলে ভালো। কিন্তু আমার মনে হচ্ছিল আপনাকে বোর করছি।

না একদম না।

মৌ একটা বেঞ্চে বসল। কালরাতে আপনাকে যে আর দেখলাম না? আপনি কি খুব তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন?

না।

তাহলে?

মানে আপনাদের সামনে আর যাওয়া হয়নি আর কী?

তাড়াতাড়ি ঘুমাবার কথা কেন জিজ্ঞেস করেছি জানেন?

কেন বলুন তো?

এই যে এরকম ভোরবেলা উঠেছেন?

আমি রোজই এসময় উঠি।

আমি উঠি না। মানে ক্লাস না থাকলে উঠি না আর কী!

আজ যে উঠলেন?

নতুন জায়গা বলে ঘুমটা হয়তো তাড়াতাড়ি ভেঙেছে। আপনি তো জানেনই, আমরা থাকছি দোতলায়। একেবারে শেষ দিককার রুমে আমি, তারপরের রুমে বাবা মা, সামনের রুমটায় নাবিল। কাঠের ঘরগুলোর অসুবিধা কী জানেন...

হাঁটলে মচ মচ শব্দ হয়।

রাইট।

তারপরই মুগ্ধ চোখে শুভর দিকে তাকালো মৌ। আপনি খুব শার্প! হ্যাঁ, মচ মচ শব্দ হয়। সেই শব্দে যে কারও ঘুম ভাঙতে পারে। এজন্য আমি চোরের মতো পা টিপে টিপে হেঁটেছি। আপনি বসুন না, বসুন।

শুভ এতক্ষণ দাঁড়িয়েই ছিল। মৌর কথায় তার মুখোমুখি বেঞ্চে বসলো।

ধন্যবাদ।

বাহ্। ধন্যবাদ শব্দটা শুনতে ভালো লাগলো তো!

কেন?

এখন কেউ আর ধন্যবাদ বলে না। বলে থ্যাংকস। তার আবার জবাবও দেয়। ইউ ওয়েলকাম।

জি আমার ধন্যবাদ বলতে ভালো লাগে।

আপনাকে একটা কথা বলি?

জি বলুন।

এত জি জি করবেন না। শুনতে ভালো লাগে না। সোজাসুজি বলবেন, বলুন।

শুভ হাসল। আচ্ছা।

আপনি দেখতে যুবক রবীন্দ্রনাথের মতো!

তাই নাকি?

হ্যাঁ। কেন, আপনি জানেন না?

না।

কেউ বলেনি কখনও?

না।

আমি প্রথম বললাম?

হ্যাঁ।

তাহলে তো এটা আমার খুব ভালো আবিষ্কার। আপনি সত্যি যুবক রবীন্দ্রনাথের মতো দেখতে। ওরকম লম্বা, সুন্দর, স্নিগ্ধ। শুধু ওই বয়সে রবীন্দ্রনাথের মুখে এমন খোঁচা খোঁচা দাড়ি ছিল না। তবে দাঁড়িটায় আপনাকে ভালোই মানিয়েছে।

শুভ হাসল। ধন্যবাদ।

মুখের মিষ্টি একটা ভঙ্গি করল মৌ। আমি অনেক কথা বলছি, না?

মৌর চোখের দিকে তাকালো শুভ। শুনতে আমার খুব ভালো লাগছে।

তা লাগছে না। এটা আপনি বানিয়ে বলছেন। আমাকে খুশি করার জন্য।

না। মিথ্যা বলার অভ্যাস আমার নেই।

সত্যি?

হ্যাঁ।

আপনি একদম মিথ্যা বলেন না?

খুব দায়ে না পড়লে বলি না। আপনি যে আমাকে যুবক রবীন্দ্রনাথের মতো বললেন, শুনে খুব ভালো লেগেছে। আমি রবীন্দ্রনাথের খুব ভক্ত। খুবই। *গীতবিতান* হচ্ছে আমার সবচাইতে প্রিয় বই।

আপনি গান করেন?

না। *গীতবিতানটা* পড়তে আমার খুব ভালো লাগে। রবীন্দ্রনাথের বাইশ শো বত্রিশটা গানই আমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়েছি। যখন মন খারাপ হয় তখনই পড়ি।

আপনার মন খারাপ হয় কেন?

শুভ হাসল। অদ্ভুত প্রশ্ন।

মৌ হাসল। সত্যি অদ্ভুত প্রশ্ন। মানুষের মন নানা কারণে খারাপ হতে পারে। গভীর আনন্দেও মানুষের মন কখনও কখনও খারাপ হয়। নিজের অজান্তে মানুষ একটু বিষণ্ন হয়। আমি একসময় রবীন্দ্রসঙ্গীত শেখার চেষ্টা করেছিলাম, জানেন?

তাই নাকি?

হ্যাঁ। রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যার একটা গানের স্কুল আছে ধানমণ্ডিতে। নাম হচ্ছে 'সুরের ধারা'। সুরের ধারায় দুতিন মাস গিয়েছিলাম। তখন কলেজে পড়ি। ভিকারুননিসা কলেজ। আমার স্কুল কলেজ দুটোই ভিকারুননিসা। তারপর নর্থসাউথ। রবীন্দ্রসঙ্গীত শেখার ইচ্ছা হলো সেকেন্ড ইয়ারে পড়ার সময়। গেলাম ভর্তি হতে। বন্যাদি আমার একটা টেস্ট নিলেন। সঙ্গে আর দুতিনজন টিচার। দুজনের নাম মনে আছে। একজন পীযূষ আরেকজন হিমাদ্রি। তিনজনের সামনে বসে চার লাইন গান করলাম। 'কে যাবি পারে, ওগো তোরা কে'। শুনে তিনজনেই বললেন গলা খুব ভালো। ভর্তি হয়ে যাও। ভর্তি হয়ে গেলাম। তিন চারমাস পর আর ভাল্লাগলো না। হঠাৎ করেই ছেড়ে দিলাম। এই, আপনি যে এত *গীতবিতান* পড়েন, বলেন তো এই গানটার পরের লাইনটা কী? আমার কিছুতেই মনে পড়ছে না।

শুভ ক্ষিপ্ত গলায় বলল 'আমি তরী নিয়ে বসে আছি নদী কিনারে'।

রাইট।

তারপর আবার সেই মিষ্টি হাসি। আমি কিন্তু পরের লাইনটা জানতাম। আপনাকে একটু পরীক্ষা করলাম। *গীতবিতান* সত্যি পড়েন কী না, বোঝার চেষ্টা করলাম।

শুভ হাসল। পাস করতে পেরে আমি খুব খুশি।

এই আপনি বোর হচ্ছেন না তো?

কেন?

এই যে আমি এত বকরবকর করছি।

আগেই বলেছি, আমার ভালো লাগছে।

কেন ভালো লাগছে?

মৌর চোখের দিকে তাকালো শুভ। এরকম প্রশ্নের উত্তর কীভাবে যে দেয়া যায়?

দিন না, যেভাবে ইচ্ছা দিন।

আপনি, আপনি খুব সুন্দর খুব সুন্দর আপনি। কথা বলেন এত স্নিগ্ধ সুন্দর করে। শুধু শুনতে ইচ্ছে করে। আপনি হাসেন এত মিষ্টি করে, মনে হয় চারদিক আলোকিত হয়ে গেছে। এরকম মানুষ কখনই কাউকে বোর করতে পারে না।

শুভর কথা শুনে মুহূর্তের জন্য মৌ যেন একটুখানি অন্যমনস্ক হলো। চোখের তারা কী রকম একটু কাঁপলো তার। একটা দোয়েল পাখি টুকটুক করে লাফাচ্ছে ঘাটলার অদূরে। হাওয়াটা তেমনই বইছে। ভোরবেলাকার আলো অনেকখানিই ফুটে গেছে। মৌ যেন এসব একটু খেয়াল করল।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

তারপর হঠাৎ করে বলল, আমার কথা তো সবই বলে ফেলেছি, এবার আপনার কথা একটু বলুন না! তার আগে বলি, কালরাতে আমি ড্রয়িংরুমে আসার আগে বাবা নিশ্চয় নাবিল সম্পর্কে আপনাকে বলেছে...

হ্যাঁ বলেছেন। আপনাদের সম্পর্কে কালরাতেই আমি সব জেনেছি।

আর এখন জানলেন আমার সম্পর্কে।

কিছুটা।

এত কথা বললাম তারপরও কিছুটা? অবশ্য এটাও ঠিক, একজন মানুষকে পুরোপুরি কখনও চেনা যায় না, বোঝা যায় না। সারাজীবন ধরে মানুষকে চিনতে হয়, বুঝতে হয়। মানুষ তো নিজেকেই নিজে সারাজীবন ধরে চিনতে পারে না। অন্যকে চিনবে কী করে? রবীন্দ্রনাথের গান আছে না 'আপনাকে এই চেনা আমার ফুরাবে না'।

রবীন্দ্রনাথের কথা শুনলেই মুগ্ধতা বাড়ে শুভর। উচ্ছ্বসিত গলায় বলল, আমি খুবই অবাক হচ্ছি!

কেন?

আপনার মুখে বারবার রবীন্দ্রনাথের কথা শুনে।

কেন, রবীন্দ্রনাথের কথা আমি বলতে পারি না?

তাতো নিশ্চয় পারেন।

তাহলে?

সাধারণত আপনার মতো সুন্দরী, বড়লোকের মেয়েরা রবীন্দ্রনাথ নজরুলের গান শোনে না। তাঁদের কবিতা পড়ে না। তারা ব্যস্ত থাকে মোবাইল ফোন কম্পিউটার বিউটি পার্লার বয়ফ্রেন্ড ইত্যাদি ইত্যাদি ব্যাপারে।

তা থাকে। কিন্তু গানও শোনে অনেকে।

শুনলেও হিন্দি ধুম ধারাক্কা শোনে। 'ব্যাক স্ট্রিট বয়েজ' শোনে...। মানে এরকম আর কী! ইদানীং 'বনিএম' আবার নতুন করে পপুলার হয়েছে। তাও শোনে অনেকে।

এবার তো আমিও অবাক হচ্ছি।

কেন?

আপনার কথা শুনে।

এমন কী কথা বললাম?

এরকম এক গ্রামে থেকে আপনি দেখছি দুনিয়ার সব খবরই রাখেন।

রাখার চেষ্টা করি।

এবার তাহলে নিজের কথাগুলো বলুন। বাবার মুখে অবশ্য কিছুটা শুনেছি।

কী শুনেছেন?

আপনি আর আপনার ফুফু গনি আংকেলের রিলেটিভ। বাড়ির দেখাশোনা করেন।

ঠিকই শুনেছেন।

ফুফুর সঙ্গে আপনি আছেন কেন? আপনার মা বাবা কোথায়? ভাইবোন?

নেই। ফুফু ছাড়া আমার আর কেউ নেই। ফুফুরও আমি ছাড়া আর কেউ নেই।

তাই নাকি?

হ্যাঁ। আমার বাবা আর ফুফু দুটিমাত্র ভাইবোন ছিলেন। বাবা ছিলেন বড়। অল্প বয়সেই মাকে হারিয়ে ছিলেন তাঁরা। আমার দাদা দর্জির কাজ করতেন। বিক্রমপুর এলাকায় দর্জিদের বলা হয়...

আমি জানি। খলিফা।

রাইট। খলিফা। জায়গা সম্পত্তি দাদার বলতে গেলে ছিলই না। চার শরিকের বাড়ির ছোট্ট একটা অংশে ছোট ছোট দুটো টিনের ঘর ছিল। আর দীঘিরপার বাজারে ছোট্ট দর্জি দোকান। আমাদের মূল বাড়ি ছিল কামারখাড়া নামের একটা গ্রামে। আমার দাদা, বাবা ফুফু তাদের যোগ্যতা ছিল একটাই, দেখতে সবাই মোটামুটি ভালো ছিলেন। কিন্তু পরিবারটি সত্যিকার অর্থে অভিশপ্ত। বাবা ম্যাট্রিক পাস করে মাত্র বিয়ে করেছেন। এক বছর পর আমি জন্মালাম। আমাকে জন্ম দিতে গিয়ে মা মারা গেলেন। দাদা মারা গেছেন বাবার বিয়ের দুবছর আগে। বাবা গ্রামের স্কুলের টিচার। আমার ফুফু খুব সুন্দরী ছিলেন বলে চট করেই তাঁর বিয়েটা দিয়ে ফেলতে পেরেছিলেন। আমার জন্মের কিছুদিন আগেই ফুফু বিধবা হয়ে ফিরে এলেন ভাইয়ের সংসারে। মা মারা গেলেন, আমি উঠে গেলাম ফুফুর কোলে। ক্লাস ফোরে পড়ছি, বাবা মারা গেলেন ক্যান্সারে। আমার চারদিকে শুধুই মৃত্যু। আমার মায়ের দিককার লোকজনরা, অর্থাৎ মামা খালারা আমার কোনো খোঁজখবরই করতো না। ফুফু বেচারি আমার জন্য নিজের জীবনটা স্যাক্রিফাইস করে দিলেন। আর বিয়েই করলেন না। ওই যে দাদার বাড়িটুকু ছিল, টিনের ঘর দুটো ছিল, প্রথমে একটা ঘর বিক্রি করে আমাকে নিয়ে বাঁচবার চেষ্টা করলেন। তারপর একসময় বাড়ির অংশটুকু চলে গেল, ঘরটা চলে গেল। আমি আর আমার ফুফু চিরকালীন উদ্বাস্তু হয়ে গনি কাকার এই বাড়িতে এসে আশ্রয় নিলাম। তিনি আমাদের অনেক দূরের আত্মীয়। তবু দয়া করে আমাদেরকে আশ্রয় দিলেন। আমাকে লেখাপড়া শেখালেন। বিএ পাসটা আমি করতে পারলাম। সংক্ষেপে এই হচ্ছে আমার জীবনী।

কথা বলতে বলতে গলা ধরে এসেছে শুভর। চোখ দুটোও ছলছল করছে। সেই চোখ লুকাবার জন্যই অন্যদিকে তাকিয়ে রইল সে।

মৌ বিষণ্ন মুখে তাকিয়ে আছে শুভর দিকে। শুভর কথা শেষ হওয়ার পর বলল, আশ্চর্য! এরকম জীবনও হয় মানুষের!

শুভ ম্লান হাসল। হয়। আমিই তার প্রমাণ।

তার মানে ফুফু না থাকলে আপনার আর কেউ থাকবে না?

সত্যিকার অর্থে কেউ থাকবে না!

তবে কেউ না কেউ হবে। মানুষ কখনও একা বাঁচতে পারে না। কেউ না কেউ তার হয়, কেউ না কেউ তার থাকে।

শুভ কথা বলল না। অন্যমনস্ক হয়ে রইল।

মৌ বলল, পরিবেশটা একটু গম্ভীর হয়ে গেছে। আসুন একটু হালকা করি। আজকের দিনটায় আমরা কী করবো বলুন তো?

শুভ স্বাভাবিক হলো। আমি ঠিক জানি না আপনাদের কী প্ল্যান?

শুনুন, আমাদের মূল প্ল্যান বাবা আপনাকে নিশ্চয় বলেছেন।

না মানে তিনি বলেছেন এই বাড়িতে সাত আটদিন থাকবেন। নাবিল সাহেব গ্রাম দেখেননি, তাঁকে গ্রাম দেখাবেন।

রাইট। তার মানেটা হলো আজ আমরা গ্রাম দেখবো।

হ্যাঁ। তা দেখতেই পারেন।

কী কী দেখার আছে বলুন তো?

গ্রামে আর দেখার কী থাকে? এই বাড়িটা দেখলেন। ওই যে উত্তর দিকে রাস্তা। তারপর শস্যের মাঠ। এখন শস্য শুধু ওই ধনচে। বর্ষার পানিতে শুধুই ধনচেক্ষেত। রাস্তাঘাট হয়ে যাওয়ার ফলে এখন আর তেমন করে বর্ষা হয় না। চকে মাঠে তেমন পানি হয় না। একসময় বিক্রমপুরের বর্ষা ছিল ভয়াবহ। বারো পনেরো হাত পানি হতো চকে মাঠে। মানুষের বাড়ির উঠোনে, ঘরে পানি উঠে যেত একেকটা বাড়ি একেকটা বিচ্ছিন্ন দ্বীপ। নৌকা ছাড়া চলাচলের কোনো ব্যবস্থা নেই। এখন তেমন বর্ষা হয় না। এই যেমন ধরুন এই বাড়ির দক্ষিণ দিকটা। দক্ষিণ দিকটায় বর্ষার পানিই নেই। কিছুদূর হেঁটে গেলে পদ্মানদী। অবশ্য এই দিকটা একটু বেশি উঁচু। এজন্যই পানিটা ওঠে নি।

নদী এখন খুব ভরাট না?

হ্যাঁ। আগের সেই পদ্মা এখন আর নেই। চর পড়ে পদ্মা ম্লান হয়ে গেছে।

এদিকটায়ও চর পড়েছে?

পড়েছে। বেশ বড় একটা চর আছে।

লোকবসতি হয়েছে চরে?

না। একেবারেই ফাঁকা। শুধু কাঁশবন। আর চরের ঠিক মাঝখানে একটা কুঁড়েঘর।

কে থাকে ওই ঘরে?

কেউ না।

মানে?

চরটা আসলে গনি কাকাদেরই। নদীতে বহু আগে তাদের ওদিককার জমি ভেঙে নিয়েছিল। চর জাগার পর সেই জমি তারা আবার ফিরে পেয়েছেন। ঘরটা এমনিতেই তুলে রেখেছেন। এখনও চাষবাসের উপযুক্ত হয়নি চর। বেলেমাটিতে আপনাআপনি গজিয়েছে কাঁশ।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

আমি শুনেছি বিক্রমপুর খুবই বিখ্যাত জায়গা। এখানে অনেক কিছু দেখার আছে।

বিখ্যাত জায়গা তো বটেই। বহু বিখ্যাত মানুষ জন্মেছেন বিক্রমপুরে। দেখার আছে, মানে মুন্সিগঞ্জের ওদিকে অনেক কিছু দেখার আছে। বল্লাল সেনের দিঘী, বাবা আদমের মসজিদ। ভাগ্যকূলের ওদিকে আছে কুণ্ডেরবাড়ি। রাড়িখালে আছে জগদীসচন্দ্র বসুর বাড়ি।'

আমার এসবে আসলে কোনো ইন্টারেস্ট নেই। তবে গনি আংকেলের বাড়িটা আমার খুব ভালো লাগছে। কোথাও না গিয়ে শুধু এই বাড়িতে বসেই সাত আটটা দিন কাটিয়ে দেয়া যায়।

তারপরও নদীতীরটায় যেতে পারেন। এই বাড়ির পুবদক্ষিণ কোণে গনি কাকাদের জায়গাতেই নদীভাঙা চল্লিশঘর মানুষ থাকে। তাদের মধ্যে একজন বয়াতি আছে। বব বয়াতি। দোতরা বাজিয়ে গান করে।

তার গান একদিন শোনা যাবে ?

এখন যাবে না।

কেন ?

বব বয়াতির কড়ে আঙুল কাটা পড়ার ঘটনাটা বলল শুভ। শুনে মৌ খুবই দুঃখ প্রকাশ করল। আহা!

সেদিন সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত একটানা বৃষ্টি।

মৌ আর শুভ ঘাটলায় বসে থাকতে থাকতেই আকাশ ছেয়ে গেল ঘন কালোমেঘে। ওরা খেয়াল করেনি। হঠাৎই ঝমঝমিয়ে এলো বৃষ্টি। ওরা দুজন দুদিকে দৌড় দিল। মৌ দৌড়ে গেল কাঠের দোতলার দিকে। এই ঘরটা ঘাটলার একেবারেই কাছে। ফলে তেমন ভিজল না সে। কিন্তু লম্বা দালানের দিকে দৌড়ে আসতে আসতে ভিজে একেবারে নেয়ে গেল শুভ।

এইভাবে শুরু হলো।

৪

শ্রাবণমাসের বৃষ্টি এরকম নাকি!

মৌ কি কখনও এরকম বৃষ্টি দেখেছে! আকাশ যেন ভেঙে পড়েছে। চারদিককার গাছপালায় আর ঘরের চালায় ঝরঝর ঝরঝর শব্দ। মাঠের মতো উঠোনটার দিকে তাকালে বৃষ্টি ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। চারদিক ভরে আছে আবছা অন্ধকারে। আকাশে শুধুই ধূসর রঙের মেঘ। মেঘের পরে মেঘ ভেসে যায়!

মৌর খুব ইচ্ছে করছে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে। উঠোনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে দুদিকে দুহাত ছড়িয়ে ঘুরপাক খেতে আর বৃষ্টিতে ভিজতে। মন ভরে বৃষ্টিতে ভিজতে।

এরকম বৃষ্টি কি আর কখনও পাওয়া যাবে!

এরকম বৃষ্টিতে কি আর কখনও ভেজা হবে!

মৌ দাঁড়িয়ে আছে দোতলার রেলিংয়ে। রেলিং থেকে হাত একটুখানি ছড়িয়ে দিলেই ছোঁয়া যাচ্ছে বৃষ্টি। মাঝে মাঝেই সে ডানহাতটা ছড়াচ্ছে, হাতটা ভিজাচ্ছে

কিন্তু হাত ভিজিয়ে আর কতটা আনন্দ! ইচ্ছে মতন ঘণ্টাখানেক ভিজতে পারলে! ইস...

একটা বোকামি অবশ্য মৌ করে ফেলেছে! শুভর সঙ্গে ঘাটলায় বসেছিল আর তখনই তো এলো বৃষ্টি। সে তো চট করে দৌড়ে চলে এলো দোতলা ঘরটির বারান্দায়। কয়েক ফোঁটা মাত্র বৃষ্টি পড়লো শরীরে। তেজায় চাপটা তখনই নেয়া যেত! তখনও মা বাবা কেউ ওঠেনি! শুভর সঙ্গেই ভেজা যেত।

না সেটা ঠিক হতো না!

কালরাতে দেখা আর আজ সকালে পরিচয়। এইটুকু পরিচয়ে একজনের সঙ্গে বৃষ্টিতে ভেজা যায় না। এরকম বৃষ্টিতে কিছুক্ষণ ভিজলেই শরীরে লেপটা লেপটি হয়ে যাবে সালোয়ার কামিজ, ওড়না যতই ব্যবহার করা হোক, শরীর কিছু না কিছু স্পষ্ট হবেই।

না না সেটা ঠিক হতো না!

কথাটা মা বাবার কানে যেতোই। বাবা কিছু না বললেও মা ওসব নিয়ে কথা শোনাতেন। যে মেয়ের বিয়ের মাত্র পাঁচ সপ্তাহের মতো বাকি সে এক অচেনা ছেলের সঙ্গে বৃষ্টিতে ভিজে কী করে! আর যার সঙ্গে বিয়ে হবে সেই ছেলেটিও যখন সঙ্গে! সে কী ভাববে!

নাবিল আমেরিকায় বড় হওয়া ছেলে! সে কি এসব নিয়ে কিছু ভাববে ?

ভাবতেও পারে!

আমেরিকায় থাকা ছেলেরা আমেরিকায় বড় হয়ে ওঠা বাঙালি মেয়েদেরকে সহজে বিয়ে করতে চায় না। এমনকি এফেয়ার হওয়ার পরও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ব্রেকআপ হয়ে যায়। কারণ ওসব দেশে বড় হয়ে ওঠা মেয়েদের বেশিরভাগই নাকি স্কুলে পড়ার সময়, ষোল সতেরো বছর বয়সে, কখনও কখনও তারও আগে বয়ফ্রেন্ডদের সঙ্গে... মানে তাদের ভার্জিনিটি থাকে না! কারও কারও একাধিক বয়ফ্রেন্ড থাকে। কিছু করার নেই। ওসব দেশের নিয়মই তো এমন।

নাবিলও সে কারণে আমেরিকায় বিয়ে করছে না। খুঁজে খুঁজে মৌকে বের করেছে।

তারপরই আমেরিকায় থাকা ছেলেদের কথাটা মনে হলো মৌর। স্কুলে পড়ার সময় থেকেই বয়ফ্রেন্ড থাকে মেয়েদের, শরীরের সম্পর্ক হয়ে যায়। এই কারণে কনজারভেটিভ বাঙালি ছেলেগুলো কিংবা তাদের ফ্যামিলি ওদেশে বড় হয়ে ওঠা মেয়েকে ছেলের বউ করতে চায় না। বেশিরভাগ ছেলেও চায় দেশ থেকে একেবারে সতী একটি মেয়েকে বউ করে আনবে। যার এখনও কোনো বয়ফ্রেন্ড কিংবা প্রেমিক হয়নি। যে এখনও ভার্জিন। যে শুধু স্বামী ছাড়া আর কিছুই বুঝবে না!

কিন্তু ছেলেটির খবর কী!

সে কি ঠিক আছে ?

এতটা বয়স হয়েছে, আমেরিকার স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটিতে পড়েছে তার কি কোনো গার্লফ্রেন্ড হয়নি ? তার কি কারও সঙ্গে এফেয়ার হয়নি। সে কি বিছানায় যায়নি কোনো মেয়ের সঙ্গে ? সে কি ভার্জিন ?

শুধু মেয়েদের দিকটাই দেখা হবে কেন ? ছেলেদের দিকটা কেন দেখা হবে না ?

এসব কথা বিয়ের কথাবার্তা শুরুর সময় একটু অন্যরকম ভাবে মায়ের সঙ্গে হয়েছিল মৌর। মা, ওরা কি আমেরিকায় কোনো বাঙালি মেয়ে খুঁজে পায়নি ?

পাবে না কেন ? আমেরিকায় কি বাঙালি মেয়ের অভাব ?

তাহলে ওখানকার মেয়েকে বিয়ে করেনি কেন ?

ওখানকার মেয়েগুলো ভালো না।

ভালো না মানে ?

তুই বুঝতে পারিস নি ?

বুঝবো না কেন ? বুঝেছি। তারপরও তোমার কাছ থেকে বুঝতে চাই।

বয়ফ্রেন্ড, ভার্জিনিটি এসব নিয়ে কথা বললেন মা। বহু মেয়ে কনসিভ করে ফেলে, এবরসন করাতে হয় অনেককে। না না এটা শুধু বিদেশে থাকা বাঙালি মেয়েদের ক্ষেত্রেই না, ওসব দেশে বসবাস করা সবার ক্ষেত্রেই। বরং বাঙালি মেয়েদের সংখ্যা কম। তারা এখনও অনেক কিছু মেনে চলে। মা বাবার কথা শোনে। নিজেকে বাঁচিয়ে চলে। বহু ভালো মেয়ে আছে বিদেশে।

নাবিল সে রকম একজনকে বিয়ে করেনি কেন ?

নিশ্চয় তেমন মেয়ে পায়নি। তাছাড়াও একটা কারণ আছে।

কী কারণ ?

নাবিলের চে' ওর মা বাবা বেশি সিরিয়াস। তারা বাংলাদেশ থেকেই ছেলের বউ নেবে।

এখন তোমাকে আমি একটা প্রশ্ন করি।

কি ?

শুধু যে বিদেশে থাকা মেয়েগুলোর দোষ এতক্ষণ ধরে সমানে দিয়ে গেলে, ওখানে থাকা ছেলেগুলোর কী অবস্থা ?

মা একটু থতমত খেলেন। না না ছেলেদেরও অনেকেরই অবস্থা ওরকমই। গার্লফ্রেন্ড থাকে, এফেয়ার থাকে। নাবিলের ওরকম কিছু নেই।

কী করে বুঝলে ?

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

আমরা নানা রকমভাবে খোঁজখবর নিয়েছি। সমন্ধটা এনেছেন তোর হারুণ মামা। তিনিও ফ্লোরিডায় থাকেন। নাবিলদেরকে খুবই ভালো করে চেনেন। মা বাবার একমাত্র ছেলে। পড়াশুনার ফাঁকে ফাঁকে বাবার বিজনেস দেখতো। মা বাবা দুজনেই একেবারে শিশুর মতো আগলে রেখেছে তাকে। এদিক ওদিক হওয়ার কোনো স্কোপ ছেলেটি পায়ইনি।

এসব তোমরা বিশ্বাস করেছো ?

কেন করবো না ? হারুণ আমার ভাই সে কি একটা খারাপ ছেলে তার ভাগ্নির জন্য দেখবে নাকি ? তারপর তোর বাবা নানারকমভাবে খোঁজখবর করেছেন। তাঁরও তো কত পরিচিত মানুষ আমেরিকায়। সবাই এক কথায় বলেছে নাবিল অসাধারণ ছেলে। এরকম ছেলে পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার! নাবিলের মা বাবার সঙ্গে কথা বলে, নাবিলের সঙ্গে কথা বলে তোর বাবা এবং আমি আমরা দুজনে তো মুগ্ধই, আমাদের আত্মীয়স্বজন যারা দেখেছে, কথা বলেছে তারাও মুগ্ধ।

মৌ তারপর ভালোরকম একটা লেকচার দিয়েছিল। দেখো মা, সারা দুনিয়াতেই সবদোষ মেয়েদের। পুরুষদের কোনো দোষ নেই। পুরুষরা যা ইচ্ছা তাই করবে, সবাই তাই মেনে নেবে। কিন্তু একটা মেয়ে! মেয়েটির পান থেকে চুন খসলেই অপরাধ। এই বিষয়টাই আমার অপছন্দ। এই অবস্থাটা আজকের পৃথিবীতে অন্তত বদলানো উচিত। একটা মেয়ের ভার্জিনিটি নষ্ট হয় একটা পুরুষের কারণেই। তাহলে দোষটা শুধু মেয়েটির হবে কেন ? কর্মটি করে নিজে সে সাধু হয়ে গেল আর মেয়েটি হলো দোষের ভাগী ? এইসব ফাজলামো এখন বন্ধ হওয়া উচিত। বিদেশে থাকা মেয়েদের চে' ছেলেদের দোষ অনেক বেশি। ওগুলো বেশি খচ্চর।

একচেটিয়া সবাইকে তুই এভাবে বলতে পারিস না।

তুমিও একচেটিয়া সব মেয়েকে বলতে পারো না।

আমি সবাইকে বলিনি।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মা বলেছিলেন, তোর আসলে মতলবটা কী ?

কিসের মতলব ?

নাবিলের ব্যাপারে।

মৌ একটু রেগেছিল। দেখো মা, আমি কিন্তু পুরো ব্যাপারটাই তোমাদের ওপর ছেড়ে দিয়েছি। আমি তোমাকে এবং বাবাকে বলেছি, আমার নিজের যেহেতু কাউকে পছন্দ নেই, আমি বিয়ে করবো তোমাদের পছন্দে। তোমরা নাবিলকে পছন্দ করেছো, আমারও তাকে খারাপ লাগেনি। সুতরাং অসুবিধা কী ? তবে বিদেশের জীবনটা আমি চাইনি। আমি দেশেই থাকতে চেয়েছিলাম।

এদেশের কোনো ভবিষ্যৎ নেই। এদেশে থেকে লাভ কী ?

এসব ফালতু কথা বলবে না। কেন দেশের ভবিষ্যৎ থাকবে না ? দেশের অসুবিধা কী ? সবাই যদি এরকম গা ছাড়া হয়ে যায়, সবাই যদি এরকম দেশ ছেড়ে বিদেশে চলে যায় আর বলে, না না এদেশের কোনো ভবিষ্যৎ নেই, বিদেশেই ভালো, তাহলে দেশটার কী হবে ? দেশ তো আর খারাপ না। খারাপ তো মানুষগুলো। আমরা নিজেরা ঠিক না হলে দেশ ঠিক হবে কী করে ?

মা হেসে ফেলেছিলেন। লেকচার ভালোই শিখেছিস। রাজনীতি করলে নেত্রী হয়ে যেতি।

আমি নেত্রী হতে চাই না। আমার কথা খুব পরিষ্কার। এই যে এদেশে থেকে আমি লেখাপড়াটা করলাম, আমার পিছনে রাষ্ট্রের বড় রকমের একটা খরচা হয়েছে। আমার উচিত দেশের জন্য সার্ভিস দেয়া। দেশের

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

কাজ করা। তা না করে আমি চলে যাচ্ছি বিদেশে সুখের জীবন কাটাবার জন্য। সুখের জীবন এদেশেও আমি কাটাতে পারি। এখন দেশে কত রকমের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। নাবিলের মতো একটা শিক্ষিত ছেলে যদি বাংলাদেশে থেকে তার সেক্টরে সার্ভিসটা দিতো, দেশ উপকৃত হতো। আমিও যদি আমার সার্ভিসটা দিতাম, দেশের কাজ করা হতো।

এভাবে ভাববার দরকার নেই। আমরা চাই আমাদের মেয়ে বিদেশে সুখে থাক। বড়টাকে কানাডায় দিয়েছি, তোকে দেব আমেরিকায়। বছরে ছমাস আমেরিকা আর কানাডায় দুইমেয়ের কাছে গিয়ে কাটাবো আমরা। তোর বাবার আর আমার প্ল্যান হচ্ছে এই রকম। তিনমাস কানাডায় ভ্রমরের কাছে, তিনমাস আমেরিকায় মৌর কাছে।

তোমরা শুধু তোমাদের দিকটাই দেখছো, দেশের কথাটা ভাবছো না।

এত কিছু ভাববার আমাদের দরকার নেই।

অবশ্যই দরকার আছে। তোমাদের না থাকলেও আমার আছে।

কী রকম?

মানুষের দুটো জায়গায় বড় রকমের দুটো ঋণ থাকে। এক মা বাবা, দুই দেশ। দুটো ঋণই মানুষের শোধ করতে হয়।

মা আবার হাসলেন। তুই একটা ঋণই শোধ কর। মা বাবার ঋণ। নাবিলকে বিয়ে করে আমেরিকায় গিয়ে সেটেল করলে আমরা খুশি হলো। আর মা বাবা খুশি মানে তাদের ঋণ শোধ।

ততদিনে নাবিলের সঙ্গে মৌর ফোনে কথা হয়েছে। মেইলে ছবি চালাচালি চলছে। নাবিল বাংলা ভালো বলতেই পারে না। মৌ ইংরেজিটা ভালো জানে। টেলিফোনে কথা আর মেইল চালাচালি, ছেলেটিকে মন্দ লাগলো না মৌর।

নাবিলের মা বাবার সঙ্গেও ফোনে কথা হলো মৌর। বাবার চে' মাটাকে বেশি ভালো লাগল। খুবই প্রাণবন্ত, সহজ সরল ধরনের ভালোমানুষ। কথা বলেন মিষ্টি করে, আদুরে ভঙ্গিতে। কথায় কথায় 'সোনা' বলেন। বাপ একটু গম্ভীর, কিন্তু ভালোমানুষ। কথাবার্তা পাকা হওয়ার পর পরিবারটা যখন দেশে এলো, যখন মেলামেশা শুরু হলো দুই পরিবারে তখন মৌ আবিষ্কার করল, নাবিলের মা হচ্ছেন তার বাবার মতো, আর বাবা হচ্ছেন মার মতো। অর্থাৎ উল্টো।

এই নিয়ে কথাবার্তা, মজা হয়েছে কম না।

ভ্রমর তখন রোজ ফোন করে। ইস দেশে তোরা এত মজা করছিস আর আমি এখানে একা পড়ে আছি। পিচ্চিটার জ্বালাতন সামলানো ছাড়া আর কিছুই করতে পারছি না।

ভ্রমরের একটা মেয়ে হয়েছে। নাম পূর্ণা। ছবির মতো সুন্দর শিশু। দেড় বছর বয়স। ফোনে দুয়েকটা শব্দ বলে, তাতেই মৌ এবং তার মা বাবা মুগ্ধ।

আজ সকালবেলা গনি আংকেলের দোতলার রেলিংয়ে দাঁড়িয়ে বৃষ্টিতে হাত ভিজাতে ভিজাতে এসব কথা মনে পড়ছে মৌর।

ভ্রমর দেশে আসবে বিশদিন পর। আসবে দুমাসের জন্য। মৌর বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর আরও কিছুদিন দেশে থেকে তারপর যাবে কানাডায়। প্রায় একই সময়ে আসবেন নাবিলের মা বাবা, মৌর হারুন মামা। তারপর ধুম উৎসব। মৌর বিয়ে।

নাবিলকে নিয়ে তার মা বাবা এসেছিলেন দেড়মাস আগে। ওদের ফ্ল্যাট আছে গুলশানে। ফ্ল্যাট তালা মারা। এক আত্মীয়র কাছে চাবি আছে। সে এসে সপ্তাহে সপ্তাহে চেক করে যায় সব ঠিকঠাক আছে কি না?

নাবিলরা এসে সেই ফ্লাটে উঠেছিল। মা বাবা মাসখানেক থেকে সব পাকাপাকি করে, মৌদের পরিবারের সঙ্গে মেলামেশা করে, একেবারে আপন হয়ে আবার ফ্লোরিডায় গেছেন। ছেলের বিয়ের সপ্তাহ দুয়েক আগে আসবেন। এদিকে সব গুছগাছ করা। নাবিলকে রেখে গেছেন মৌর সঙ্গে সহজ হয়ে ওঠার জন্য। সে থাকছে তাদের গুলশানের ফ্ল্যাটে ঠিকই কিন্তু ওটা নামে মাত্র। প্রায় সারাদিনই পড়ে আছে মৌদের বাড়িতে। বাইরে টাইরে তেমন যায় না। মৌর সঙ্গে মিশছে, আড্ডা দিচ্ছে, টিভি দেখছে, গান শুনছে। মৌর মা বাবার সঙ্গে মিশছে। কখনও কখনও মার সঙ্গে শপিংয়ে চলে যাচ্ছে। একেবারে ঘরের ছেলেটি হয়ে গেছে।

সেই ঘরের ছেলেটি এখন ওই তো মা বাবার পাশের রুমে ঘুমাচ্ছে। তার খবরই নেই কটা বাজলো! বাইরে এরকম বৃষ্টি। নাশতা খেতে হবে!

এসময় মা বাবার রুমের দরজা খুলে গেল। দুজন প্রায় একইসঙ্গে ঘর থেকে বেরুলেন। বাবার পরনে সাদা ট্রাউজার্স আর সাদা ঢোলা টিশার্ট, মার পরনে আকাশির ওপর সাদা ছোট ছোট ফুল আঁকা সুতির নাইটি। বাইরে এরকম বৃষ্টি দেখে দুজনেই মুগ্ধ।

বাবা বললেন, ইস কী দারুণ বৃষ্টি!

মা বললেন, বৃষ্টির শব্দেই আমার ঘুমটা ভেঙেছে।

বাবা মৌর দিকে তাকালেন। কখন উঠেছো মা?

অনেক আগে। ভোরবেলা। তখনও বৃষ্টি শুরু হয়নি।

তাই নাকি?

হ্যাঁ। খুব সুন্দর লাগছিল তখন চারদিক।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

ঘাটলায় গিয়ে বসেছিলাম। ওই যে শুভ, সেও ছিল। অনেক গল্প করলাম তার সঙ্গে। সে রবীন্দ্রনাথের মহাভক্ত।

মৌ মার দিকে তাকালো। মা, আমি একটু বৃষ্টিতে ভিজি?

কথাটা যেন বুঝতে পারলেন না মা। কী করবি?

বৃষ্টিতে ভিজবো। ওই উঠোনে গিয়ে অল্প কিছুক্ষণ ভিজবো মা। তারপর গোসল করে ফেলবো।

মা কঠিন গলায় বললেন, না।

কেন? কী হবে?

বৃষ্টিতে ভিজলেই জ্বর আসবে।

বাবা বললেন, তোমার টনসিলের প্রবলেম আছে। এসময় জ্বরটর এলে, টনসিল ফুললে ঝামেলা হবে।

মা বললেন, বিয়ের বেশিদিন বাকি নেই। এসময় জ্বরজ্বারি হওয়া ঠিক না।

মৌ আর একবার বলবার চেষ্টা করলো। মা কঠিন গলায় বললেন, না। এসব হবে না। যাও, ওয়াসরুমে যাও। ফ্রেশ হয়ে আসো। আমরা এখন চা খাবো।

মৌ জানে, আর কথা চলবে না। মা যা বলেছেন এখন তাই করতে হবে। সে গম্ভীর মুখে নিজের রুমে গিয়ে ঢুকল।

বাবা তখন মাকে বলছেন, কিন্তু এই বৃষ্টিতে ডাইনিংরুমে যাব কেমন করে?

মা বললেন, ওখানে যাব না।

তাহলে?

ওই যে কদম না কী যেন নাম লোকটার তাকে ফোন করো। বলো আমাদের চা ড্রয়িংরুমে নিয়ে আসতে।

এই বৃষ্টিতে কীভাবে আনবে?

সেটা তোমার সমস্যা না। সেটা ওদের সমস্যা। আমরা গেস্ট, আমাদের টেককেয়ার করা ওদের কাজ। কদম আছে, শুভ নামের ছেলেটা আছে, ওরা ছাতাটাতা নিয়ে ম্যানেজ করবে।

ঠিকই বলেছো। আমি কদমকে ফোন করছি।

নিজের রুম থেকেই মৌ শুনতে পেল মোবাইলে কদমের সঙ্গে কথা বলছেন বাবা। আমাদের চা ড্রয়িংরুমে নিয়ে এসো। না না আগে চা খাব, নাশতা আধাঘন্টা পর।

মৌর মেজাজ তখন বেশ খারাপ। সে মা বাবার সব কথাই শুনছে কিন্তু মা বাবা তার একটা কথাও শোনে না। বৃষ্টিতে ভিজে জ্বর যদি একটু হয়ও অসুবিধা কী? টনসিল ফুললে ওষুদ খাবে, ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু এরকম বৃষ্টিতে ভেজার সুযোগ সে কি আর জীবনে পাবে?

নিচে এসে চা খেতে খেতে মার সঙ্গে ছোটখাটো একটা ঝগড়াই লাগিয়ে দিল মৌ।

চা দিয়ে গেছে কদম আর বোচার মা। বোচার মার হাতে ধরা ছিল চায়ের ট্রে আর

www.BanglaBook.org

কদমের হাতে ছাতা। ছিটেফোঁটা ভেজা দুজনেই ভিজেছে, তবু চায়ের ট্রেতে পড়তে দেয়নি একফোঁটা বৃষ্টি। বাবা বলেছেন, নাশতাও এভাবেই দিয়ে যেও কদম। এই বৃষ্টিতে আমরা মুভ করতে পারবো না।

জি ঠিক আছে স্যার।

নাশতা কী?

মুরগি ভুনা আর চাউলের রুটি।

বাহ্। দারুণ নাশতা। তবে নাশতার পর কিন্তু আবার চা দেবে।

কদম হেসেছে। কোনো অসুবিধা নাই স্যার। যতবার চাইবেন ততবার চা দেব।

কদম আর বোচার মা চলে যাওয়ার পর মা চা ঢালতে ঢালতে বললেন, আধাঘন্টার মধ্যে যে নাশতা দিতে বললে, নাবিল কি ততক্ষণে উঠবে?

না উঠুক।

মানে?

ওর নাশতা থাকবে। যখন উঠবে তখন খাবে।

ঠাণ্ডা হয়ে যাবে না? চাউলের রুটি ঠাণ্ডা হলে শক্ত হয়ে যায়। ঠাণ্ডা মুরগির ঝোল আর শক্ত রুটি ছেলেটা খেতে পারবে?

তাও ঠিক।

একটা কাজ করো, নাবিলকে ফোন করো। বলো উঠে নাশতা করে তারপর যেন আবার ঘুমায়।

গুড আইডিয়া।

বাবা প্রায় তখনই ফোন করেন। মা তাকে ধমক দিলেন। তোমার আর বুদ্ধিসুদ্ধি হলো না। এখনই ফোন করছো কেন? নাশতা দেবে আধাঘন্টা পর, তার পাঁচসাত মিনিট আগে করো। এখনই ছেলেটার ঘুম ভাঙাচ্ছো কেন?

ঠিক বলেছো। তখনই করবো।

মৌ এতক্ষণ ধরে একটাও কথা বলেনি। চায়ে চুমুক দিয়ে হঠাৎ বলল, মা। আমি কি কখনও তোমাদের কোনো কথার অবাধ্য হয়েছি?

মা একটু থতমত খেলেন। মানে?

মানে মানে করবে না। যা জানতে চাইছি তার জবাব দাও।

বাবা বললেন, তুই এত গুরু গম্ভীর প্রশ্ন করছিস কেন?

কারণ আছে।

কী কারণ?

মা আমার কথার জবাব দিলে ধীরে ধীরে বুঝতে পারবে।

মৌ মার দিকে তাকালো। বলো মা।

মা বললেন, অবাধ্য মানে কী? কী বলতে চাস?

তোমরা বলেছো আর সেই কাজ আমি কখনও করিনি, এমন হয়েছে?

মা না, বাবা বললেন, না। আমাদের কথা সবই তুই শুনেছিস।

তোমাকে না বললাম তুমি জবাব দেবে না।

বাবা চায়ে চুমুক দিয়ে হাসলেন। একথা কখন বললি? আরে তোর মার আর আমার জবাব তো একই হবে। অসুবিধা কী?

মা বললেন, তুই কী বলবি আমি বুঝতে পেরেছি।

বলো কী বলবো?

বলবি বিয়ের ব্যাপারেও আমরা যা বলেছি তুই তা শুনেছিস।

রাইট। আমার জীবনের সবচাইতে বড় সিদ্ধান্তটাও তোমরাই নিয়েছো আর আমি সেটা মেনে নিয়েছি।

এজন্য আমরা তোর ওপর খুশি।

কিন্তু আমি তোমাদের ওপর খুশি না।

কেন?

তোমাদের সবকথা আমি শুনবো আর তোমরা আমার একটা কথাও শুনবে না, এটা কেমন কথা।

বাবা বললেন, তোর কোন কথা আমরা শুনি নি?

আজই তো শোননি। আমি বৃষ্টিতে ভিজতে চাইলাম, তোমরা মানা করলে।

মা বললেন, কেন করেছি সেটা তুই বুঝিসনি?

বুঝেছি। জ্বর আসতে পারে, টনসিল ফুলতে পারে।

হ্যাঁ। বিয়ের আগে জ্বরজ্বারি হলে...

কী হবে বিয়ের আগে জ্বরজ্বারি হলে? আর বৃষ্টিতে ভিজলেই আমার জ্বর আসবে এমন তো কোনো কথা নেই। জ্বর তো বৃষ্টিতে না ভিজলেও হতে পারে।

বাবা বললেন, তবু মা বাবা ছেলেমেয়েদেরকে এভাবেই আগলে রাখে।

তোমরা একটু বেশি আগলাচ্ছো। ছেলেমেয়েদের ভালোলাগা মন্দলাগার দিকেও মা বাবার খেয়াল রাখা উচিত।

মা বললেন, তুই যত যাই বলিস এরকম বৃষ্টিতে তোকে আমি ভিজতে দেবো না। কিছুতেই না।

সেটা আমি জানি।

চা শেষ করল না মৌ, উঠে রাণী ভঙ্গিতে বারান্দায় চলে গেল। বারান্দায় বেশ কয়েকটি হালকা ধরনের সুন্দর চেয়ার রাখা আছে। একটা চেয়ারে মুখ গোমড়া করে বসে রইল। মার প্ল্যান মতো নাবিলকে একসময় ফোন করলেন বাবা। চোখ ডলতে ডলতে নিচে নেমে এলো নাবিল। কদমের সঙ্গে এবার আর বোচার মা এলো না, এলো শুভ। তারা দুজন মিলে নাশতা নিয়ে এলো ড্রয়িংরুমে। তিনবার আসা-যাওয়া করতে হলো তাদের। শুভ ধরে রেখেছে ছাতা আর কদমের হাতে নাশতার ট্রে। কদম ভিজছে, তার মাথায় ছাতা ধরেনি শুভ। ধরেছে নাশতার ট্রের ওপর।

দৃশ্যটি খুবই অমানবিক মনে হলো মৌর। আর শুভকে এই কাজটা করতে দেখে ভালো লাগল না তার।

কেন কে জানে!

নাশতা করতে করতে বাবা কদমকে জিজ্ঞেস করলেন, দুপুরে আজ কী মাছ খাওয়াবে কদম?

কদম হাসিমুখে বলল, আইড়। বিরাট একটা আইড় জোগাড় করছি।

কবে জোগাড় করলে?

আইজ সকালেই।

এই বৃষ্টিতেই?

হ। বৃষ্টিতেই মাওয়ার ঘাটে গেছি। বাইশশো টাকা নিছে আইড়ের দাম।

মা উচ্ছ্বসিত গলায় বললেন, তাহলে তো অনেক বড় আইড় হবে?

জি বড়, অনেক বড়।

একপলক মৌর দিকে তাকিয়ে শুভ তখন ছাতা মাথায় উঠোনে নেমেছে। তার খালি পা। পরনে ভেজা ট্রাউজার্স আর টিশার্ট। বৃষ্টি সেই আগের মতোই। এরকম বৃষ্টি ছাতাতে মানবার কথা না। শুভর মুখ মাথা সবই ভেজা। তবু তাকে যে কী সুন্দর লাগে!

মৌর মনে হলো এত সুন্দর একজন মানুষের জীবন এত করুণ!

৫

দুপুরবেলা বৃষ্টি থেমে গেল।

থামা মানে একেবারেই থামা। বৃষ্টির ছিটেফোঁটাও নেই। আকাশ পরিষ্কার হয়ে চারদিক আলোকিত হয়ে গেল। দেখে বাবা খুব খুশি। যাক এখন ডাইনিংরুমে গিয়েই লাঞ্চটা করা যাবে।

মৌ এখন আর সকালবেলার মতো গম্ভীর না। বৃষ্টিতে ভিজতে না পারার দুঃখ ভুলে প্রাণবন্ত হয়েছে। গোসল করে জিন্স আর ইটরঙয়ের সুন্দর ফতুয়া পরেছে। গাঢ় নীল আর সোনালি রঙের দুমড়ানো মোচড়ানো এক ধরনের ওড়না অনেকটা মাফলারের মতো করে গলায় প্যাঁচিয়েছে। তবে একেবারেই লুজ করে প্যাঁচানো। ফলে বুকের ওপর এসে পড়েছে ওড়না। কোনো প্রসাধন নেই কিছু নেই, তবু যে কী অসাধারণ সুন্দর লাগে তাকে!

নাবিল ঠিকই নাশতা সেরে আবার ঘুমাতে চলে গিয়েছিল। উঠেছে পৌনে একটার দিকে। এতক্ষণে মা বাবা মৌ সবাই গোসল টোসল সেরে যে যার মতো। বাবা মা তাদের রুমে শুয়ে বসে আড্ডা দিচ্ছে। মৌ কিছুক্ষণ নিজের রুমে ছিল। তারপর দোতলার উত্তর দিককার বারান্দায় এসে

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

বসেছে। হাতে এমপি ফোর, কানে হেডফোন। রেজওয়ান চৌধুরী বন্যার রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনেছে একটার পর একটা।

এসময় কানাডার অটোয়া থেকে ভ্রমরের ফোন এলো। কী রে, কী করছিস?

মোবাইল ফোন হওয়াতে কী যে সুবিধা হয়েছে! পৃথিবীটা হাতের একেবারে মুঠোয় চলে এসেছে মানুষের। ইচ্ছে হলো আর মুহূর্তে কানাডা থেকে বাংলাদেশ। খরচও তেমন না। দশ ডলারের একটা কার্ড কিনলে, তাও কানাডিয়ান ডলারের কার্ড, তিনঘণ্টা কথা বলা যায়! এরচে' সস্তা আর কী হতে পারে!

মৌ এমপি ফোর অফ করল। গান শুনছি। বন্যাদির রবীন্দ্রসঙ্গীত।

তোর এই 'বন্যাদি' ডাকাটা আমার খুব ভালো লাগে। মনে হয় তিনি তোর খুবই কাছের মানুষ।

আরে! কাছের মানুষ তো বটেই। আমি তাঁর ছাত্রী ছিলাম না!

সেটা আর কদিনের জন্য!

যে কদিনের জন্যই হোক।

পাপা আম্মু কোথায়?

উপরেই আছে।

রুমে?

হ্যাঁ। আমার আজ দুজনের ওপরই খুব মেজাজ খারাপ হয়েছে!

কেন?

বৃষ্টিতে ভিজতে না দেয়ার কথা বলল মৌ। জ্বর টনসিল, বিয়ের আগে জ্বর হওয়ার সমস্যা অর্থাৎ যা যাযা যা যা বলেছেন সবই বোনকে খুলে বলল মৌ। শেষে বলল, বল তো আপু, এরকম বৃষ্টি, এরকম পরিবেশ আমি আর জীবনে পাব!

না তা পাবি না। তবে পাপা আম্মু কিন্তু ঠিকই করেছে। বিয়ের আগে অসুখ বিসুখ হলে তোর গ্ল্যামারটা কমে যাবে।

তুই তো এটাই বলবি। তুই তো আমার পক্ষের না, আমার মতোও না। আমি মাকে বলি মা, তুই বলিস আম্মু। বাবাকে বলি বাবা, তুই বলিস পাপা।

ভ্রমর খিলখিল করে হেসে উঠল।

মৌ বলল, হাসবি না। আমার মেজাজ সত্যি খারাপ। বন্যাদির গান শুনে মেজাজ ভালো করছি।

ভালো হয়েছে?

কিছুটা হয়েছে।

কিছুটা না, পুরো ভালো হওয়া উচিত।

কেন?

তুই তোর অবস্থাটা ভাব তো?

কী ভাববো?

পাপা আম্মু দুজনের সঙ্গেই আমার কথা হয়েছে। নাবিলের সঙ্গেও কথা হয়েছে। তিনজনই বলল, গনি আংকেলের বাড়িটা অসাধারণ। পরিবেশ অসাধারণ।

তাতো আমিও বলছি। এত সুন্দর বাড়ি, এত সুন্দর জায়গা, এখানে না এলে আমি কিন্তু বিশ্বাসই করতাম না।

বুঝলাম। কিন্তু আমি বলতে চাচ্ছি অন্যকথা।

কী কথা?

তোর ভাগ্যের কথা।

আমার ভাগ্যের আবার কী হলো?

তুই খুবই লাকি! বিয়ের আগেই বর নিয়ে ওরকম একটা জায়গায় বেড়াতে চলে গেছিস।

আমি এভাবে ভাবিই নি।

মানে?

নাবিল সঙ্গে আছে ওটা নিয়ে আমি একেবারেই থ্রিল্ড না।

বলিস কী!

হ্যাঁ।

কেন?

কি জানি! ব্যাপারটা আমার কাছে খুব একটা এট্রাকটিভ কিছু মনেই হচ্ছে না।

কারণ কী?

কোনো কারণ নেই।

নিশ্চয় কোনো কারণ আছে।

আরে না।

মৌ, তোকে আমি একটা কথা জিজ্ঞেস করি?

শিওর।

তোর কি নাবিলকে পছন্দ হয়নি?

হবে না কেন? না হলে তোকে আমি বলতাম না!

তাহলে তোর এমন মনে হচ্ছে কেন? তুই নাবিলের সঙ্গে মেলামেশা করছিস না?

মেলামেশা মানে?

না না আমি অন্যকিছু মিন করিনি। মানে ওকে নিয়ে ঘুরে বেড়ানো, গল্পগুজব করা ইত্যাদি।

সেসব তো অনেকদিন ধরেই করছি। ওতো বলতে গেলে আমাদের বাড়িতেই থাকে। শুধু রাতের কয়েকটা ঘন্টা ছাড়া সব সময়ই তো ওকে দেখছি। ওকে আমার এখন আর নতুন মানুষ মনেই হয় না। বাড়ির লোকের মতোই আছে। ওকে নিয়ে আমার এক্সট্রা কোনো চার্ম নেই।

এটা তো ঠিক না।

কেন?

চার্ম থাকবে না কেন?

কেন থাকবে না আমি কী করে বলবো!

না না এই এটিচুটটা তোর বদলাতে হবে।

কী করতে হবে আমাকে?

ওকে বেশি বেশি সময় দে। ওর সঙ্গে সঙ্গে থাক।

একটা অসুবিধা আছে।

কী?

ওটা এখন বলবো না।

আমি তোর বড়বোন হলেও তোর বন্ধুর মতো। মতো না, বন্ধুই। আমাকে কিন্তু তুই সবই বলতে পারিস।

তা পারি।

তাহলে বল।

বেশি ঘনিষ্ঠ হতে গেলে ও যদি অন্যরকম কিছু এক্সপেক্ট করে বসে?

হ্যাঁ তা অবশ্য করতে পারে।

একটু থেমে ভ্রমর বলল, করলে অসুবিধা কী?

মৌ চমকালো। কী বলছিস আপা?

খারাপ কী বলছি। মাত্র চার পাঁচসপ্তাহ পর তার সঙ্গে তোর বিয়ে হচ্ছে। সব ঠিকঠাক। সে সত্যিকার অর্থে তোর বর হয়েই গেছে। এই অবস্থায়...

না না ওসব আমার কাছে খুবই নোংরা মনে হবে। ঘনিষ্ঠতা বিয়ের পরই হবে। এখন ও আমার হাত ধরলেও আমার অস্বস্তি লাগবে।

নাবিল তোর হাত কখনও ধরেনি?

না।

বলিস কী?

হ্যাঁ। তুই এত অবাক হচ্ছিস কেন?

এটা তো অবাক হওয়ার মতোই ঘটনা।

কেন?

উত্তর ওই একটাই। বলতে গেলে বর সে তোর হয়েই গেছে।

না বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত কেউ কারও বর হয় না।

তুই দেখি খুবই কনজারভেটিভ। তুই যে এমন এটা তো আমি বুঝতে পারিনি। আচ্ছা, তোর কখনও ইচ্ছে করেনি নাবিলের হাত ধরার?

বললে তুই বিশ্বাস করবি?

কেন করবো না?

না আমার কখনও ইচ্ছে করেনি।

কারণটা কী?

কোনো কারণ নেই। নাবিল দুয়েকবার ধরতে চেয়েছে, আমার অস্বস্তি লেগেছে। ধরতে দেইনি। বলেছি, বিয়ের পর ধরবেন।

তুই কি তাকে আপনি করে বলিস?

হ্যাঁ।

আরে?

তুই এত অবাক হচ্ছিস কেন, আপু?

এসব তো অবাক হওয়ার মতোই কথা। আজকালকার মেয়েরা এরকম হয় নাকি? তার ওপর তোর মতো স্মার্ট সুন্দরী এত ভালো স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটিতে পড়া মেয়ে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

আমার কেন এরকম হচ্ছে আমি ঠিক জানি না। বোধহয় নাবিল আমার কাছে খুবই সস্তা হয়ে গেছে।

কীভাবে ?

এভাবে আমাদের সঙ্গে মেলামেশা করে। ওর উচিত ছিল দেশে এসে আমাকে দেখেছে বা ফ্লোরিডা থেকে ফোনে কথা হয়েছে, মেইল টেইল করেছে ওটুকুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকা। তাহলে বোধহয় আমার চার্মটা থাকতো।

ঠিকই বলেছিস। এটা একটা কারণ হতে পারে। কিন্তু এই অবস্থাটা বদলাতে হবে মৌ।

কেন ?

বিয়ের আগে পরের কতগুলো দিন খুবই আনন্দময় হয় মানুষের জীবনে। এই অবস্থাটা না বদলালে তোর আনন্দটা নষ্ট হয়ে যাবে।

এটা কিন্তু আমারও মনে হয়েছে আপু।

তাহলে ব্যাপারটা তুই ঠিক কর।

কীভাবে কী করবো ?

ওর সঙ্গে বেশি বেশি মেলামেশা কর। গল্প আড্ডা ইত্যাদি।

সমস্যা আর একটাও আছে।

কী ?

নাবিল তো বাংলাটাও ভালো মতো বলতে পারে না। পড়ে আছেন না বলে, পড়িয়া আছেন।

কাকে বলেছে ?

এই বাড়ির একজনকে। ছেলেটার নাম শুভ। যাহোক এটা কোনো সমস্যা না। ইংরেজি আমি ভালোই বলি। নাবিলের সঙ্গে ইংরেজিই বলি। সব সময় ইংরেজি বলতে ভালো লাগে না।

তারপরও এই অবস্থাটা কাটাতে হবে।

আমি চেষ্টা করবো।

অম্মু কি তোর কাছাকাছি আছে নাকি রে ?

কেন ? মাকে এসব বলবি ?

আরে না।

তাহলে ?

একটু কথা বলতাম। ঠিক আছে থাক, আমি পরে আম্মুকে ফোন দেবো।

রাখবি এখন ?

হ্যাঁ।

ওকে। ভালো থাকিস।

ভ্রমরের সঙ্গে কথা শেষ হওয়ার কিছুক্ষণ পর ডাইনিংরুমে খেতে এলো সবাই। খাবার রেডি করে কদম এসেছে ডাকতে. দলবেধে চারজন মানুষ এসে বসল টেবিলে। একপাশে মৌ আর নাবিল, আরেক পাশে মা বাবা। টেবিলে চমৎকার করে সাজানো সবকিছু।

এই রুমে আসতে আসতেই নাবিলকে যেন নতুন করে আজ দেখলো মৌ। বোধহয় ভ্রমর ওসব বলেছে বলে।

গোসল শেভ ইত্যাদি সেরে নাবিল এখন খুবই ফ্রেশ। প্রচুর ঘুমাবার ফলে মুখটা ফোলা ফোলা। আফটার শেভের একটা গন্ধ আসছে গা থেকে। পরেছে লুজ ধরনের অফ হোয়াইট ট্রাউজার্স আর হালকা হলুদ পেলোর টিশার্ট। ভালোই লাগছে তাকে দেখতে।

নাবিলের প্লেটে খুবই যত্নে খাবার তুলে দিল মৌ।

নাবিল হাসিমুখে বলল, থ্যাংকস।

ইউ ওয়েলকাম।

কদম দাঁড়িয়ে আছে একপাশে। যদি কিছু প্রয়োজন হয় এগিয়ে দেবে। বোচার মা রান্নাবান্নার কাজ শেষ করে এখনও বসে আছে কিচেনে। অতিথিদের খাওয়া-দাওয়া হলে সে কদমকে নিয়ে যাবে। তারপর হয় বাড়ি গিয়ে দু'তিনঘণ্টা কাটিয়ে আসবে নয়তো ফুফুর রুমের মেঝেতে গিয়ে মাদুর

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

বিছিয়ে একটা ঘুম দেবে। বিকেলের দিকে উঠে চা নাশতার ব্যবস্থা করবে। তারপর রাতের রান্নার আয়োজন।

একদিন রাতেরবেলা বোচার মা এই বাড়িতেই থাকবে। বৃষ্টি বাদলার দিন নাহলে হয়তো বাড়ি চলে যেতো। যত রাতই হোক কাজ কাম সেরে, রাতের খাওয়া দাওয়া সেরে বাড়ি যেতো, ফজরের আজানের সঙ্গে সঙ্গে চলে আসতো। এখন একদিকে যখন তখন ঝমঝম করে নামছে বৃষ্টি, অন্যদিকে রাস্তাঘাট কাদাপানিতে একাকার, এই অবস্থায় বাড়ি না যাওয়াই ভালো। তাছাড়া বাড়িতে তেমন কেউ তার নেইও। বোচা, বোচার বউ আর পাঁচটা নতি নাতনি। তাদেরকে দুয়েকদিন না দেখলে মনটা অবশ্য আইঢাই আইঢাই করে। এজন্য হয়তো আজ বিকেলের দিকে একবার গিয়ে নাতি নাতনিদের দেখে আসতে পারে।

এখন রান্নাঘরে বসে বোচার মা তার প্রশংসা শুনতে পাচ্ছে।

প্রশংসা শুরু করলেন এনাম সাহেব। কদম, এই বাড়ির রান্না কে করে?

বোচার মার কথা বললেন।

এনাম সাহেব বললেন, খুবই চমৎকার রান্না। মাছটা যা হয়েছে না! বহুদিন এত ভালো রান্না খাইনি।

মৌ জানে তার বাবার একটু বাড়িয়ে বলার অভ্যাস আছে। যদিও বোচার মার রান্না ভালো। ভালো মানে বেশ ভালো। কিন্তু বহুদিন এত ভালো রান্না বাবা খায়নি এটা বোধহয় ঠিক না। তাদের বাড়ির নূরজাহান বুয়াটাও খুব ভালো রান্না করে।

কথাটা মৌ একবার তুলতে চাইলো। তার আগেই মা তুললেন। বহুদিন খাওনি মানে কী? আমাদের বাড়ির রান্না কি খারাপ?

মা কথা তুললেই বাবা চুপসে যান।

এখনও গেলেন। না মানে, হয়তো মাছটা খুবই তাজা বলে...

মৌ এবং নাবিল দুজনেই হেসে ফেলল।

নাবিল বলল, আপনাদের এই প্রকার ঝগড়া আমার অনেক ভালো লাগে।

মৌ বলল, আর আমার কী ভালো লাগে জানেন না?

না জানি না।

আপনার এই প্রকার বাংলা বলা।

নাবিল হাসল। আমাকে তুমি তাহলে বাংলা ভাষাটা শিক্ষা দাও।

মাও নাবিলকে সাপোর্ট করলেন। হ্যাঁ তুই ওকে ভালো বাংলাটা শেখা মৌ।

মৌ আবার হাসল। শিখাবো না, শিক্ষা দেব।

এনাম সাহেব তখন খুবই মজা করে আড় মাছের পেটির দিককার একটা টুকরো ভেঙে ভেঙে খাচ্ছেন। ভাতের চেয়ে মাছই বেশি খাওয়া হচ্ছে তাঁর।

মৌর তখন বারবারই ভ্রমরের কথা মনে হচ্ছে। ভ্রমর ওসব বলার পর থেকেই কি সে নাবিলের দিকে একটু বেশি মনোযোগ দিচ্ছে? কথা বলছে, মজা করছে। বাবা মা কি ব্যাপারটা খেয়াল করছেন?

মাও বেশ বড় এক টুকরো মাছ নিয়েছেন। সেই মাছের টুকরো ভাঙতে ভাঙতে কদমের দিকে তাকালেন। ওই যে শুভ না কী নাম ছেলেটার, সে কোথায়? তাকে দেখছি না যে।

কদম বলল, সে ভাতপানি খেয়ে কোথায় জানি গেল।

বাবা বললেন, আর তার ফুফু? সেই ভদ্রমহিলাকে তো দেখলাম না।

তিনি বাড়িতেই আছেন। ডাকবো?

না না ডাকতে হবে না

তারপর নাবিলের দিকে তাকালেন তিনি। নাবিল বাবা, খাচ্ছো ঠিক মতো?

জ্বি আংকেল। খাইতেছি।

মাছটার টেস্ট কেমন?

একসিলেন্ট।

মৌ সঙ্গে সঙ্গে বলল, আরেক টুকরো দেব?

না না, এতো খাইতে পারিব না।

মৌ বলল, গত দুদিন ধরে খেয়াল করছি আপনার ভাষাটা যেন বেশি খারাপ। এত খারাপ তো ছিল না। বাংলাদেশে এতদিন ধরে আছেন, আমাদের সঙ্গে মেলামেশা করছেন, ভাষা তো এতদিনে ঠিক হয়ে যাওয়ার কথা। আপনার দেখি উল্টো হচ্ছে। দিনে দিনে পারিবো না টানিলো না বেশি বেশি বলছেন।

নাবিল কথা বলল না। কী রকম একটা হাসি ফুটলো তার ঠোঁটে।

মা বললেন, তোমার বাবা মা দুজনেই তো ভালো বাংলা বলেন, তোমার অবস্থা এমন কেন?

নাবিল হাসিমুখে বলল, কইতে পারি না।

মৌ বলল, কইতে না, বলুন বলতে পারি না।

বলতে পারি না।

এই তো শিখছেন।

তুমি শিখাইলে আই মিন ভেরি ফার্স্ট শিখিয়া ফেলিব।

মৌ ভুরু কুঁচকে নাবিলের দিকে তাকালো। আপনি ইচ্ছে করে এভাবে কথা বলছেন না তো?

না না। আমি ইচ্ছা করিয়া, আই মিন ইচ্ছা করে করিতেছি, আই মিন করছি না।

নাবিলের অবস্থা দেখে আর কথা শুনে মা বাবা মৌ তো হাসছিলই, কদমের মুখেও হাসি।

খাওয়া-দাওয়া শেষ হয়ে আসছে, শুভর ফুফু তার রুম থেকে বেরিয়ে এলেন। ডাইনিংরুমের দরজায় এসে দাঁড়ালেন।

কদম বলল, এই যে ইনি হইতেছেন শুভ মামুর ফুবু।

চারজন মানুষ একসঙ্গে তাঁর দিকে তাকালো।

অতি সাধারণ একজন মহিলা।

পরনে সাদা পুরনো শাড়ি, সাদা ব্লাউজ। কিন্তু খুবই পরিচ্ছন্ন। মাথায় ঘোমটা দেয়া। ঘোমটা দেয়ার ভঙ্গিতে বনেদিআনা বোঝা যায়। কপালের দিকটা খালি। ঘোমটা দিয়েছেন কপালের বেশ কিছুটা ওপর থেকে। মাথার সাদাকালো চুল এই বয়সেও বেশ ঘন। মাঝারি ধরনের হাইট। তবে তাঁর মুখের দিকে তাকালে চোখ ফিরানো যায় না। টকটকে গায়ের রং। খাড়া নাক, চোখ দুটো সত্যিকার অর্থেই পটলচেরা। মুখখানি যে কী সুন্দর। স্নিগ্ধতায় ভরা, মায়ামমতায় ভরা মুখ বুঝি একেই বলে।

মা বাবা নাবিল তাঁর দিক থেকে চোখ ফিরাতে পারলো কী না মৌ খেয়াল করল না, কিন্তু সে আর চোখ ফিরাতে পারে না।

তখন শেষ আইটেম নিয়ে ব্যস্ত সবাই। মাওয়ার বাজারের বিখ্যাত সেন্টুর দোকানের রসগোল্লা আর দই তুলে নিচ্ছিল যে যার পেয়ালায়। মৌর সেদিকে খেয়ালই নেই। সে মুগ্ধচোখে তাকিয়ে আছে শুভর ফুফুর দিকে।

তাকে মানুষ এত সুন্দর বলে, কিন্তু তার বয়সে এই মহিলা তো বিস্ময়কর সুন্দরী ছিলেন।

মা বললেন, কী রে মৌ, দই মিষ্টি খাবি না?

মৌ মার দিকে তাকালো। না।

বাবা চামচে রসগোল্লা কেটে দইয়ের সঙ্গে খেতে খেতে বললেন, আরে খা। খেয়ে দেখ। দইটা যেমন ভালো, রসগোল্লাটাও।

নাবিলও খাচ্ছে। সে বলল, অতি সুস্বাদু। খাইয়া দেখো মৌ।

শুভর ফুফু তারপর প্রথম কথা বললেন, খাও মা। এখানকার দই মিষ্টিতে ফ্যাট কম। খাঁটি দুধ দিয়ে করে তো! খেতে ভালো লাগবে।

আরে, এরকম গ্রাম্য মহিলা এত সুন্দর করে কথা বলেন! দেখতে যেমন সুন্দর, ভাষাও তেমন সুন্দর।

তাঁর কথা ফেলতে পারলো না মৌ। অল্প একটু দই আর একটা রসগোল্লা নিল।

বাবা শুভর ফুফুর দিকে তাকালেন। আপনারা আমাদের খুব যত্ন করছেন। আমরা খুবই আনন্দিত।

শুভর ফুফু স্নিগ্ধ গলায় হাসিমুখে বললেন, তেমন কিছু আর কোথায় করতে পারলাম। আপনারা আসছেন এমন দিনে, শ্রাবণমাস। শুধু বৃষ্টি বাদল। এই অবস্থায় বিশেষ কিছু করা যায় না।

মা বললেন, তবু অনেক করছেন।

বাবা বললেন, আপনার সঙ্গে তো পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়নি...

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

আমি আপনাদের পরিচয় জানি। গনিদাদার বউ, আমি তাকে ডাকি ভাবিছাব, আমাদের বিক্রমপুরের ভাষা। ভাবিছাব আমাকে সব বলেছেন :

মা বললেন, আমার মেয়ে মেয়েজামাই কেমন দেখছেন ?

মাশাল্লা খুব সুন্দর মেয়ে আপনার। পরির মতো। জামাইও মাশাল্লা মেয়ের সঙ্গে খুবই মানিয়েছে। আল্লাহ তাদেরকে সুখী করুক।

বাবা বললেন, দোয়া করবেন।

নিশ্চয় নিশ্চয়।

মৌর তখন একটা কথা বারবার মনে হচ্ছে, আসলেই কি নাবিলের সঙ্গে তাকে খুব মানায় ? নাবিল তারচে' আট বছরের বড়। সেটা অবশ্য তেমন কোনো ব্যাপার না। স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর পাঁচসাত বছরের গ্যাপ থাকতেই পারে। যদিও মৌদের জেনারেশানের ছেলেমেয়েরা ব্যাচম্যাট, ক্লাসমেটদের বেশি বিয়ে করছে। সমবয়সি বর বেশি পছন্দ করছে। মৌ অবশ্য ওটা পছন্দ করে না। তার যুক্তিটা অন্যরকম। ছেলেদের তুলনায় মেয়েরা তাড়াতাড়ি বুড়ো হয়। একটা দুটো বাচ্চা হলেও গ্ল্যামার কমতে থাকে। সমবয়সি বর হলে একটা বয়সে বর ঠিকই ইয়াং থাকবে আর মেয়েটি যাবে বুড়ি হয়ে। চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সেই জীবনে ভাটা পড়ে যাবে।

তারপর আজই প্রথম মৌর মনে হলো, এত স্বাভাবিকভাবে এগিয়েছে সব, এতদিন ধরে এত কথা হয়েছে নাবিলের সঙ্গে, এত দেখা অর্থাৎ বিয়ে এখনও হয়নি ঠিকই তবু নাবিল সে তার বর হয়েই গেছে কিন্তু সে কি আসলে নাবিলকে পছন্দ করেছে ? নাকি সবাই নাবিলের অতিরিক্ত প্রশংসা করতে করতে তার মনে একটা প্রভাব বিস্তার করেছে। একটা ঘোর তৈরি করে দিয়েছে তার মধ্যে

এই ঘোর কি ভালো লাগার!

পছন্দের!

ভালোবাসার!

প্রেমের!

সত্যিকার অর্থে মৌ কি নাবিলকে মন থেকে পছন্দ করেছে ? নাবিলকে কি ভালো লেগেছে তার ? ভালোবাসা কি কিছুটা তৈরি হয়েছে নাবিলের জন্য ? প্রেম ? প্রেম না হলে একজন মানুষের সঙ্গে সারাটা জীবন সে কেমন করে কাটাবে ? কী করে ফ্লোরিডার ওয়েস্ট পামবিচের নির্জন জীবনে একজন মানুষকে আশ্রয় করে বেঁচে থাকবে সে ?

এই প্রথম কেমন যেন একটু দিশেহারা হলো মৌ।

খাওয়া-দাওয়া শেষ করার পরও ডাইনিংটেবিলে বসে আছে সবাই। শুভর ফুফু আগের মতোই বিনয়ী ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছেন দরজার কাছে। বাইরে তখন সোনার আলোর মতো একটুখানি রোদ উঠেছে।

কথা বললেন বাবা, শুভকে দেখছি না। সে কোথায় ?

কথাটা আগেও একবার উঠেছিল। কদম তার মতো জবাব দিয়েছিল। কিন্তু এখন বাবা আসলে শুভর ফুফুর কাছে জানতে চাইছেন। বোধহয় তিনি শুভর ওপর একটু বিরক্ত। তাঁর হয়তো মনে হচ্ছে, শুভর উচিত সারাক্ষণ তাদের সঙ্গে থাকা, তাদের টেককেয়ার করা। কদম তো করছেই, কিন্তু কদম আর শুভ তো এক না!

ফুফু বললেন, আর বলবেন না ভাই। এই ছেলেটাকে নিয়ে আর পারি না। নিজের খেয়ে বনের মোষ তাড়িয়ে যাচ্ছে। চারদিককার গ্রামে কার কোথায় কী হলো, কার অসুখ হলো, কে বিপদে পড়লো, কাকে একটু সাহায্য সহযোগিতা করলে সে প্রাণে বাঁচে, এই নিয়ে আছে। ওসব ছাড়া আর কিছু করেই না। দুটো টিউশনি করে, টাকা পয়সা যেটুকু পায় সব ওইসব কাজেই খরচা করে ফেলে।

অন্যকেউ কিছুই বলল না। মৌ মনে মনে বলল, মানুষের তো এমনই হওয়া উচিত। মানুষের বিপদে মানুষের পাশে দাঁড়ায় না যে মানুষ, সে কি মানুষ ?

কিন্তু এই বৃষ্টি বাদলায় শুভ গেছে কোথায় ?

৬

রব বয়াতির বউ হাজেরা অসহায় ভঙ্গিতে বসে আছে ছাপড়া ঘরটার সামনে।

পারুল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। শেফালির কোলে তার আট নয় মাসের ছেলেটা। খুবই দুষ্টু প্রকৃতির শিশু। মায়ের কোলে থাকতেই চাইছে না। বারবার পিছলে নামার চেষ্টা করছে কোল থেকে। চোখ পাকিয়ে শেফালি তার দিকে তাকাচ্ছে আর ধমক দিচ্ছে। এ্যাই! তারপর শক্ত করে ধরে রাখছে কোলে! শেফালির মেয়েটি সাড়ে তিনবছরের। তাকে আজ আনেনি শেফালি। শাশুড়ির কাছে রেখে এসেছে।

রব বয়াতির ছাগল দুটো একটা খুটির সঙ্গে উঠোনের কোণে বাঁধা। দুটোই খাসি। বেশ তাগড়া, তেল চকচকে। বাঁধা অবস্থায় থাকাটা তারা পছন্দ করছে না। দুটোই থেকে থেকে ম্যা ম্যা করছে। ফইজু দাঁড়িয়ে আছে ছাগল দুটোর সামনে। তার পরনে সবুজ লুঙ্গি আর সাদা ময়লা ধরনের হাফহাতা শার্ট। ঝিমকালো মুখখানা বসন্তের দাগে ভরা। খুবই বিশ্রী চেহারা। ফুক ফুক করে সিগ্রেট টানছে। হাওয়ায় ভাসছে সিগ্রেটের কড়া গন্ধ।

শুভ তাকিয়ে আছে পারুলের মুখের দিকে। মেয়েটির কান্নায় তার মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে গেছে।

ফইজু এসে শুভর সামনে দাঁড়ালো। কী কন দাদা ? দাম ওই সাড়ে সাত।

শেফালি বলল, না সাড়ে সাতে দিমু না।

পারুল কাঁদতে কাঁদতে বলল, বাবার খুব শখের খাসি দুইডা। হায় হায় হেই খাসি বেইচ্চা ফালাইতাছে ?

শেফালি তাকে একটা ধমক দিল। বাবার জানের থিকা খাসি বেশি হইল ? বিশহাজার টেকা লাগবো। হেই টেকা না দিলে বাবারে হাসপাতাল থিকা ছাড়বো ?

হাজেরা বলল, আগে হাসপাতালে দেওয়া হইছে পাঁচহাজার, সাত আটহাজার যাইহোক, খাসি বেচনের টেকার পরও তো ম্যালা টেকা বাকি থাকে। হেই টেকার বেবস্থা কেমনে হইব ?

ফইজু সিগ্রেট টানতে টানতে বলল, শুভদাদা, এই সব প্যাচাইল শুইনা আমার তো কোনো লাভ নাই। সাড়ে সাতহাজারে খাসি দুইডা বেচতে চাইলে কন, খুতিতে টেকা আছে, গইনা দিয়া খাসি লইয়া যাইগা। আমরা ভাই কামের মানুষ। টাইম নষ্ট করনের টাইম নাই।

শুভ হাজেরার দিকে তাকালো। কী কও মামানী ? ফইজু তো সাড়ে সাতের উপরে উঠতাছে না!

হাজেরা বলল, এইসব আমি জানি না বাজান। তুমি যা কইবা সেইটাই হইব!

সবকিছু আমার ওপর চাপাও কেন ?

শেফালি বলল, আপনেরে ছাড়া আর কারে কমু কন ? আমগ আছে কে ?

পারুল কথা বলল না। সে আগের মতোই কাঁদছে আর বিলাপ করছে। বাবার এত আদরের খাসি...

শুভ গম্ভীর মুখে পারুলের দিকে তাকালো। শীতল গলায় বলল, তুই কিন্তু আমার একটা ধমক খাবি।

তারপর ফইজুর দিকে তাকালো শুভ। ফইজু, আর পাঁচশো টাকা বাড়াতে হবে। আটহাজার দাও, খাসি নিয়ে চলে যাও।

ফইজু ফুক ফুক করে সিগ্রেটে শেষ দুটো টান দিল। তারপর টোকা মেরে সিগ্রেটের পিছনটা ফেলে দিয়ে বলল, না দাদা হেইডা পারুম না। দুই খাসিতে আমার পাচশো টেকা লাভই হইব না।

শুভ তৎক্ষণে বেশ কঠিন। আমি তোমার লাভ লোকসান বুঝি না। আটের কমে খাসি দেব না। নিতে চাইলে নাও, নয়তো যাও।

এতটা আশা করেনি ফইজু। সে একটু থতমত খেল। চেতেন ক্যান দাদা ? আমরা গরিব মানুষ, দুইডা পয়সা লাভের আশায় খাসি কিনতে আইছি! লাভটা তো আমরা চামুঐ।

সেটা আমি বুঝি। কিন্তু আটের নিচে খাসি দেব না।

তয় আর কী! রাস্তা মাপি!

ঠিক আছে যাও।

ফইজু হন হন করে হেঁটে কিছুদূর গেল, গিয়ে আবার ফিরে এলো। এইসব ধান্দাবাজ লোক যা করে আর কী! দেখেন শুভদাদা, আমি আবারও কইতাছি, সাড়ে সাতের

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

উপরে এই খাসি আপনেরা বেচতে পারবেন না। আমারেঐ দিয়া দেন।

না। আট।

তারপরও খানিক খ্যাচর ম্যাচর করলো ফইজু তারপর খতি থেকে পাঁচশো টাকার ষোলটা নোট গুণে দিল শুভর হাতে। আপনের লগে আর পারলাম না দাদা। নেন আটঐ নেন। আমার লাভটা ইকটু কম হইল আর কী!

ফইজু যখন দড়ি ধরে খাসি দুটো টেনে নিয়ে চলে যাচ্ছে তখন বয়াতির পরিবারের তিনজন মানুষই কাঁদছে। হাজেরা আর শেফালি কাঁদছে নিঃশব্দে, পারুল তার স্বভাব মতো শব্দ করে, বিলাপ করে। হায় হায় রে, আমার বাপের এত শখের খাসি দুইডা...

আটহাজার টাকা হাতে শুভ তখন স্তব্ধ হয়ে আছে।

কিন্তু এতকিছুর পরও তো সাত আটহাজার টাকা আরও দরকার। ডাক্তাররা বলেছেন হাজার বিশেক লাগবে। একহাজার বেশিও তো লাগতে পারে! সেই টাকাটা আসবে কোত্থেকে! আগামীকাল তিনদিন হবে। কালই হাসপাতাল থেকে ছাড়িয়ে আনতে হবে বয়াতিকে। বাকি টাকার ব্যবস্থা এত তাড়াতাড়ি কোত্থেকে হবে!

শেফালির ছেলেটা কোন ফাঁকে যেন নেমে গেছে মায়ের কোল থেকে। এখন বেলেমাটিতে হামাগুড়ি দিচ্ছে, উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে। শেফালি এখন আর ফিরেও তাকাচ্ছে না তার দিকে। আঁচলে চোখ মুছছে।

শুভ বলল, এইভাবে কান্নাকাটি করে কোনো লাভ নেই। বাকি টাকার ব্যবস্থা কীভাবে হবে সেটা ভাবা উচিত।

হাজেরা চোখ মুছতে মুছতে বলল, আমগ তো কোনো উপায় নাই বাজান। দশটাটেকা সাহায্য দেওনের মতন কেঐ নাই।

শেফালি বলল, আপনেগ জামাইর পকেটে যা আছিল ওইটা লইয়াঐ বাবার লগে হাসপাতালে পইড়া রইছে সে। আমার শ্বশুরবাড়ির অবস্থা ভালো না। আপনেগ জামাইর কাছে যা আছে ওইটাও পুরাটা সে খরচা করতে পারবো না। হয়তো হাজারখানি পারবো...। কাইল বাবারে হাসপাতাল থিকা ছাড়াইতো হইব দেইখা আমিঐ ফইজুরে খবর দিছিলাম। আমিঐ খাসি বেচনের কথা কইছি। এই রকম মেঘবিষ্টিতে ভিজ্জা পোলাডারে লইয়া এই বাড়িতে আইছি। আমি আর কী করুম কন।

না না তোর আর কী করার আছে। বুদ্ধি করে যে খাসি দুটো বিক্রি করার কথা ভেবেছিস এটাই যথেষ্ট। ফইজুকে খবর দিয়ে ভালো করেছিস।

পারুল কাঁদতে কাঁদতে বলল, তয় বাকি টেকা জোগাড় হইব কেমনে?

এই প্রশ্নের কী জবাব দেবে শুভ। সে অসহায় ভঙ্গিতে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

ততক্ষণে বিকেল হয়ে গেছে। বৃষ্টির পর চমৎকার রোদ উঠেছে। বিকেলবেলার মোলায়েম রোদে নদীতীরের চল্লিশঘর মানুষ যে যার বিষয়কর্মে ব্যস্ত। দুচারজন সহানুভূতিশীল মানুষ ভিড় করে আছে বয়াতির ঘরের সামনে। দুদশটি টাকা দিয়ে বয়াতিকে সাহায্য করার সামর্থ্য তাদের নেই। তারা শুধু হায় আফসোস করে!

তবে একটা কাজ তারা করেছিল, যে ট্রলারের ধাক্কায় বয়াতির আঙুল কাটা পড়েছে সেই ট্রলারের মালিককে ধরেছিল কিছু টাকা পয়সার জন্য। বয়াতির চিকিৎসার টাকা। লোকটা অতিশয় ধুরন্ধর। বলেছিল, দোষটা তার ট্রলারের না। দোষটা বয়াতির। ওভাবে দাঁড়িয়ে থাকা তার ঠিক হয়নি। তবু কিছু সাহায্য সে করবে। কিন্তু কাল বিকেল থেকেই লোকটার দেখা নেই। তার দুটি ট্রলারের একটিও কাল থেকে আর দেখা যাচ্ছে না। এই ঘাটের দিকে ট্রলার আর আসছেই না। আজ সকালে ওই বৃষ্টির মধ্যেই কানাঘুষায় শোনা গেছে, ট্রলার মালিক তার দুটো ট্রলার নিয়ে 'সামুর বাড়ি' গ্রামে গিয়ে ঘাটি করেছে। এদিকে সে আর আসবে না। একদিকে বয়াতির জন্য অল্প বিস্তর যা হোক দিতে হবে, অন্যদিকে এই ঘাটে পারাপারের লোক কম। তার লাভ হওয়া তো দূরের কথা। তেল খরচাই নাকি ওঠে না।

অর্থাৎ লোকটা কেটে পড়েছে।

হাবু নামে চল্লিশঘরের একঘরের একটা ছেলে আছে। একটু মানান টাইপ। সে বলেছে, যেমন করে পারে, যেদিন পারে ট্রলারঅলাকে সে ধরবে, কিছু না কিছু আদায় করে ছাড়বে। বয়াতির কাটা আঙুলের দাম তাকে দিতেই হবে।

সেসব যখন হবে তখন, এখন উপায় কী?

এখন বাকি টাকা আসবে কোত্থেকে? কাল বয়াতিকে হাসপাতাল থেকে না আনতে পারলে খরচা আরও বেড়ে যাবে। হাসপাতালে যত বেশিদিন থাকবে শুভ খরচা।

পারুল কাঁদতে কাঁদতে শুভর সামনে এসে দাঁড়াল। দুহাতে শুভর একটা হাত ধরে বলল, আমগ কোনো উপায় নাই শুভদাদা। আপনে আমার বাবারে হাসপাতাল থিকা ছাড়ায়া আনেন। আমরা আপনের লেইগা খালি দোয়া করুম। আমগ আর কিছু করনের নাই। আল্লায় আপনের ভালো করবো।

শুভ জানে না সে কী করবে?

মানুষের এইসব অসহায়ত্বে সে কাতর হয়। তার মন কাঁদে। জানে না কোত্থেকে কী করবে, তবু অসহায় মানুষকে তার তরসা দিতে ইচ্ছে করে। বিপদ থেকে উদ্ধার করে মানুষকে ফিরিয়ে দিতে ইচ্ছে করে তাদের সুখের জীবন।

এখনও তেমন এক অনুভূতি হলো শুভর।

ডানহাতটা গভীর মমতায় পারুলের মাথায় রাখলো সে। মায়াবী গলায় বলল, তুই চিন্তা করিস না। বয়াতি মামাকে আমি কাল যেমন করে পারি হাসপাতাল থেকে নিয়ে আসবো।

ঠিক এই দৃশ্যটা দূর থেকে দেখতে পেল মৌ।

শুভ একটি মেয়ের মাথায় হাত রেখে কী কী বলছে। মেয়েটি কাঁদছে, তাদের চারপাশে ভিড় করে আছে কয়েকজন নারীপুরুষ, শিশু। একটি ছোট্ট শিশু মাটিতে হামাগুড়ি দিচ্ছে।

শুভ তখনও দেখতে পায়নি মৌকে।

মেয়েটির মাথা থেকে হাত সরিয়ে হন হন করে হাঁটা দিল সে। মৌ যেদিক থেকে হেঁটে আসছে সেদিকেই হেঁটে আসছে শুভ। কিন্তু মুখটা মাটির দিকে, মৌকে দেখতেই পায়নি। দেখতে পেল একেবারে কাছে এসে। প্রায় মুখোমুখি।

মৌকে এদিকটায় দেখে ভালো রকম চমকালো শুভ। আপনি?

মৌ হাসল। হ্যাঁ।

একা?

হ্যাঁ।

অন্যরা কোথায়?

বাড়িতে। বললাম, বৃষ্টি শেষ হয়ে গেছে। এত সুন্দর রোদ, চলো সবাই মিলে এদিক ওদিক একটু ঘুরে আসি। কেউ রাজি হলো না।

কেন?

বললো, রোদ উঠলে কী হবে, রাস্তাঘাটে কাদাপানি জমে আছে। এই অবস্থায় বেরুবো না। আমাকেও বেরুতে দিতে চাইছিল না।

তাহলে আপনি বেরুলেন কী করে?

জোর করে।

মানে?

বললাম আমি সবসময় ঘরে বসে থাকতে পারবো না। আমার হাঁসফাঁস লাগছে। আর এখানে তো ঘরে বসে থাকার জন্য আসিনি।

তা তো বটেই।

শুভ খেয়াল করে মৌকে দেখলো। জিন্সের ওপর হালকা পিংক কালারের সুন্দর ফুলস্লিভ শার্ট পরেছে। পায়ে সুন্দর কেডস। মাথার চুল টেনে সুন্দর করে পিছনে ঝুঁটি করা। ভারি সুন্দর লাগছে তাকে।

শুভ বলল, কাদাপানিতে হাঁটার একেবারে উপযুক্ত হয়ে বেরিয়েছেন।

কেমন?

জিন্স কেডস।

কিন্তু এদিকে তো কাদাপানি নেই। সব তো বেলেমাটি।

হ্যাঁ।

সাধারণ স্যান্ডেল পরেই মুভ করা যেত।

তা যেত। তবে এই ধরনের কেডস পরলে আরামে হাঁটা যায়।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

ইস ওরা সত্যি মিস করছে। এদিকটা খুব সুন্দর।

ওদেরকে ফোন করে দিন না। চলে আসুক।

মনে হয় আসবে না। মা বাবাকে দেখে এলাম ওই ঘাটলায় বসে গল্প করছে।

আর নাবিল সাহেব ? তাকে নিয়ে বেরুতেন ?

সে তো আছে ল্যাপটপ নিয়ে। আমার চে' ল্যাপটপ তার অনেক বেশি প্রিয়।

তাই নাকি ?

মৌ হাসল। আমার ধারণা।

শুভও হাসল। ও আচ্ছা। কিন্তু আপনাকে একা বেরুতে দিল ?

দিতে চায়নি।

তাহলে ?

আমি জোর করে বেরিয়েছি। আমার সকাল থেকে মেজাজ খারাপ ছিল, এজন্য এখন আর বেশি ঘাঁটায়নি।

কেন মেজাজ খারাপ ছিল কেন ?

বৃষ্টিতে ভিজতে চেয়েছিলাম, ভিজতে দেয়নি।

ও।

আর এমন সব কথা বলছিল। বৃষ্টিতে ভিজলে জ্বর হবে, টনসিল ফুলবে।

আপনার টনসিলের প্রবলেম আছে ?

একটু আছে।

তাহলে তো মা বাবা সাবধান একটু করবেনই। তবে বৃষ্টিতে ভিজলেই যে জ্বর আসবে, টনসিল ফুলে যাবে এমন কোনো কথা নেই।

তাই তো! আরে আপনি আমার মা বাবাকে চেনেন না। আমাকে আইসক্রিমটা পর্যন্ত খেতে দেয় না। অথচ আইসক্রিম যে আমি কী পছন্দ করি। তাদেরকে বলিনি, আমেরিকায় গিয়ে আমি ধুমছে আইসক্রিম খাব।

আচ্ছা তারপর কী হলো ?

কখন তারপর কী হলো ?

মানে এখন একা একা বেরুলেন কীভাবে ?

বলেছি, সকালবেলা তোমরা আমাকে বৃষ্টিতে ভিজতে দাওনি। এখন বলছি, চলো সবাই মিলে বেড়াতে বেরোই, বলছো কাদাপানিতে যাবে না। আমি যাব। তোমরা না গেলে আমি একাই যাব। এই পুরো এলাকাটা গনি আংকেলদের। সুতরাং এখানে আমি স্বাধীন। মা বললেন, নাবিলকে নিয়ে যা। বললাম তাকে। সে বলল, তুমি যাও। আমি একটু ইন্টারনেটে বসি। তারপর আমি একা বেরিয়েছি।

শুভ একবার দূরের মসজিদটার দিকে তাকালো। তাকিয়ে আবার মৌর দিকে তাকালো। না, আপনি একা বেরোননি।

মৌ অবাক মানে ?

আপনার সঙ্গে একজন পাহারাদার আছে।

কী বলছেন আপনি ?

সত্যি। দূর থেকে সে আপনাকে ফলো করছে।

মানে ?

হ্যাঁ। লোকটার নাম কদম।

তাই নাকি ?

হ্যাঁ। ওই যে দেখুন আপনি দাঁড়িয়েছেন বলে সেও দাঁড়িয়ে গেছে।

মৌ সঙ্গে সঙ্গে পিছন ফিরল। দূরে কদমকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলো। হ্যাঁ কদম দাঁড়িয়ে আছে ঠিকই কিন্তু সে যে আমাকে ফলো করছে কী করে বুবলেন ?

আমার ধারণা।

আপনার ধারণা ভুল।

কেন ?

সে হয়তো ওখানে দাঁড়িয়ে আছে অন্য কোনো কাজে।

আমার মনে হয় না। সে আপনাকে ফলো করছে।

না ফলো করার কোনো কারণ নেই। বাবা মা দুজনেই আমাকে বললেন পুরো এলাকাটা গনি আংকেলদের। এখানে একা একা মুভ করতে আমার কোনো অসুবিধা নেই।

সেটা ঠিকই বলেছেন।

তাহলে ?

বলার পরও কদমকে আপনার পিছনে পাঠিয়েছেন।

আর ইউ সিওর ?

সিওর।

প্রমাণ করতে পারবেন ?

আপনি চান প্রমাণ করি ?

চাই।

তাহলে তো করতেই হয়।

শুভ হাত ইশারায় কদমকে ডাকলো। সেই ফাঁকে মৌ খেয়াল করল শুভর পোশাকও প্রায় তার মতোই। ফেডেড জিন্সের ওপর হালকা সবুজ রঙের টিশার্ট। পায়ে অল্পদামি কেডস। বিকেলবেলার মোলায়েম রোদ মুখে পড়ায়, সত্যি সত্যি দেবদূতের মতো লাগছে তাকে।

কদম ততক্ষণে পা চালিয়ে এসে হাজির। কী মামু, ডাকলা ক্যান ?

শুভ হাসল। একটা কথা প্রমাণ করার জন্য।

কী কথা ?

তুমি ওখানে দাঁড়িয়ে কী করছিলে ?

কদম আমতা গলায় বলল, না কিছু না। তেমুন কিছু না।

আমার কাছে লুকিয়ে লাভ নেই। বলো।

কদম মৌকে দেখলো। তার জন্য আসতে হইছে।

মৌ চমকালো। মানে ?

মানে হইল সাহেব আর বেগম সাহেব বললেন, মাইয়াটা একলা একল ঘুরতে গেল। তুমি একটু তার দিকে খেয়াল রাখো। আমি বললাম, এইদিকে কোনো অসুবিধা নাই। তার দিকে কেউ চোখ তুইলা তাকাইবো না। সবাই তারে দেইখাই বুঝবো তালুকদার বাড়ির অতিথি। সাহেব মেমসাহেব বললেন, তারপরও তুমি যাও। একটু খেয়াল রাখো।

শুভ হাসিমুখে মৌর দিকে তাকালো। আমার অনুমান ঠিক হলো ?

মৌ গম্ভীর। তাই তো দেখছি।

কদম বলল, তয় আর একখান কথাও বলছেন।

কী কথা ?

আপনে য্যান বুঝতে না পারেন আমি আপনের পিছনে আছি।

শুভ বলল, এখন তো বুঝেই ফেলল।

হ সেইটাই দেখতাছি। তয় আমি তো একটা বিপাকে পড়লাম মামু।

কিসের বিপাক ?

সাহেব বেগম সাহেবের কানে যদি যায় যে আমি ঘটনাটা তোমাদের বইলা দিছি তয় তারা আমারে ভালো জনবো না।

মৌ বলল, না না আপনার কোনো অসুবিধা নেই। বাবা মাকে আমি এটা বুঝতে দেব না।

তয় আমি এখন কী করুম ?

এদিকে কোথাও বসে কারও সঙ্গে আড্ডা দেন। কারণ এখন বাড়ি ফিরে গেলে তারা আপনাকে সন্দেহ করবে।

হ ভাববে কামডা আমি করি নাই।

হ্যাঁ। আমি এদিকে ঘুরেটুরে যখন ফিরবো তখন আপনি তাদেরকে বুঝাবার জন্য আমার পিছু পিছু যাবেন।

জি আইচ্ছা।

শুভ বলল, গুড প্ল্যান। চলুন তাহলে আপনাকে এদিকটা ঘুরে দেখাই। ধয়াতিদের ওদিকটায় যাবেন ?

না ওদিকটায় যাওয়ার কিছু নেই। মানুষজন আমার ভালো লাগছে না। আমি একটু নদীর দিকটায় যেতে চাই।

ওই তো নদী। ওই দিকটায় গেলেই ভালো করে দেখতে পাবেন। যান।

আমি একা যাব ?

আপনি না বললেন আপনার মানুষজন ভালো লাগছে না ?

আরে বাবা সেটা তো আপনার জন্য বলিনি। আপনি চলুন আমার সঙ্গে। আপনি সঙ্গে থাকলে আমার খুব ভালো লাগবে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

কদম বলল, হ মামু তোমরা নদীর দিকে যাও। আমি গিয়া বয়াতির বাড়িতে একটু পান তামাক খাই। সন্ধ্যার দিকে এই রাস্তায় আইসা দাঁড়াইয়া থাকুম নে।

ঠিক আছে।

শুভ মৌর দিকে তাকালো। চলুন।

ওরা দুজন নদীর দিকে হাঁটতে লাগল।

হাঁটতে হাঁটতে মৌ বলল, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব?

নিশ্চয়।

আমি দূর থেকে দেখলাম আপনি একটা মেয়ের মাথায় হাত দিয়ে কী কী বলছেন আর মেয়েটা আপনার হাত ধরে কাঁদছে। ব্যাপারটা কী বলুন তো?

আর বলবেন না! মেয়েটা হচ্ছে পারুল। বয়াতির ছোটমেয়ে।

ওই যে বয়াতির আঙুল কাটা পড়েছে?

হ্যাঁ।

ভদ্রলোক এখন কোথায়?

মুন্সিগঞ্জ হাসপাতালে। কাল তাকে হাসপাতাল থেকে রিলিজ করবে। হাজারবিশেক টাকা লাগবে। পাঁচহাজার টাকা গতকাল আমি জমা দিয়ে এসেছি। বয়াতিরই টাকা। দুটো ছাগল ছিল। সেই দুটো খানিক আগে আটহাজার টাকায় বিক্রি হয়েছে। দুপুরবেলা খেয়েই আমি বেরিয়েছিলাম। এজন্য দুপুরে আপনাদের সঙ্গে আর দেখা হয়নি। আমি এসেছিলাম খোঁজখবর নিতে। টাকা কীভাবে জোগাড় হবে ইত্যাদি ইত্যাদি জানতে। এসে দেখি ছাগল কেনার জন্য একটা লোক এসেছে। সাড়ে সাতহাজার টাকা দাম বলছে। আমি বলে কয়ে আটে বিক্রি করলাম। বাকি টাকার কোনো ব্যবস্থা নেই। পারুল আমার হাত ধরে কাঁদছিল আর বলছিল আমি যেন এই বিপদ থেকে ওদেরকে উদ্ধার করি। আমি কীভাবে করি বলুন তো? আমার তো কোনো রোজগার নেই। নামেমাত্র দুটো টিউশনি করি। সামান্য যা টাকা পাই তাতে এদিক ওদিক যাওয়ার রিকশা ভাড়াই হয় না। তারপরও ঘর জন্য যতটুকু পারি করার চেষ্টা করি। কিন্তু সাত আটহাজার টাকা আমি কোত্থেকে ম্যানেজ করবো! তবু মেয়েটার কান্না দেখে এমন লাগলো, মাথায় হাত দিয়ে সান্ত্বনা দিয়ে এলাম। মানুষের এরকম কষ্টের মুখ সহ্য করা যায়, বলুন?

শুভর মুখের দিকে তাকালো মৌ। কিন্তু টাকাটা আপনি পাবেন কোথায়?

তা আমি জানি না। কীভাবে কী হবে তা আমি এখনও বুঝতেই পারছি না।

সান্ত্বনা তো মেয়েটিকে দিয়ে এলেন।

তাই তো! মনটা এত এলোমেলো হয়ে আছে, কিছু ভাবতেই পারছি না। আপনার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর থেকে একটু ভালো লাগছে। কিন্তু আপনি একা একা বেড়াতে চাইছিলেন, আমি থাকায় আপনার সেই আনন্দ নষ্ট হচ্ছে না তো?

সেরকম হলে আমি আপনাকে সঙ্গে নিতাম না।

ওরা ততদিনে নদীতীরে চলে এসেছে। শ্রাবণমাসের ভরা পদ্মায় বেশ একটা স্রোতের টান। পশ্চিম থেকে পুবে বয়ে যাচ্ছে নদী। নদীর এপারে ডাঙায় খানিকটা টেনে তোলা একটা ডিঙ্গি নৌকা। নৌকার যেটুকু অংশ নদীর জলে সেখানে ছোট ছোট ঢেউয়ের মৃদু ছলাৎ ছলাৎ একটা শব্দ। এদিকটায় কোনো লোকজন নেই, বাড়িঘর নেই। তালুকদার বাড়ি থেকে নদীর এদিকটা পর্যন্ত খোলা নির্জন একখানা মাঠ। দুপুর পর্যন্ত বৃষ্টিতে ভিজে মাঠের ঘাস এখন শেষ বিকেলের রোদে বেশি সবুজ হয়েছে। নদীর ওপারে সাদা বালির চর আর কাঁশবন। চরের দিক থেকে উড়ে আসছে দিনশেষের দুয়েকটা পাখি।

মৌ মুগ্ধ গলায় বলল, বাহ্ কী সুন্দর জায়গা!

শুভ নদীর দিকে তাকিয়ে বলল, হ্যাঁ এই জায়গাটা আমারও খুব প্রিয়। প্রায়ই বিকেল সন্ধ্যার দিকে একা একা আমি এদিকটায় চলে আসি। একা একা ঘুরে বেড়াই। ওই নৌকাটায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি।

নৌকাটা কাদের?

আমাদেরই। মানে গনি কাকাদের।

ওই চরটা কাদের?

ওটাও গনি কাকাদের।

ও এই চরটার কথাই আপনি সকালবেলা বলেছিলেন?

হ্যাঁ।

ওই যে কুড়েঘরটার কথা বলছিলেন ওটা কত দূরে?

চরের মাঝখানটায়। চরটা কিন্তু খুব বড় না। আধাঘন্টাখানেক হাঁটলে চরের ওপাশটায় চলে যাওয়া যায়।

তার মানে উত্তর থেকে দক্ষিণে যেতে হবে।

হ্যাঁ।

চরের ওপাশে কি আবার নদী?

হ্যাঁ। পদ্মাই। মাঝখানে চর পড়ে নদী ভাগ হয়ে গেছে।

শুভ একটু চুপ করে রইল। তারপর বলল, কোনো কোনোদিন বিকেলবেলা এই নৌকাটা নিয়ে আমি একা একা ওই চরে চলে যাই। জায়গাটা অদ্ভুত নির্জন। চারদিকে খাঁ খাঁ চর আর কাঁশবন। হঠাৎ একটুখানি একটা কুঁড়েঘর। হাঁটতে হাঁটতে সেই ঘরটার কাছে চলে যাই আমি। ঘরটার সামনে দাঁড়িয়ে থাকি। কী যে নির্জন চারদিক! হাওয়ার শব্দ ছাড়া কোথাও কোনো শব্দ নেই। আমার শুধু মনে হয় এ এক অন্য পৃথিবী। খুব ছোট্ট জনমানবহীন এক পৃথিবী। এই পৃথিবীতে আমি ছাড়া আর কেউ নেই। আশ্চর্য এক অনুভূতি হয়, জানেন।

মৌ মুগ্ধচোখে শুভর দিকে তাকিয়ে আছে। তার মুখ থেকে চোখই যেন সরাতে পারছে না।

শুভ মৌর দিকে তাকাচ্ছে না। চরের দিকে তাকিয়ে তার মতো করেই আশ্চর্য এক ঘোরলাগা গলায় বলে যাচ্ছে। একদিন অনেকটা রাত পর্যন্ত একা একা চরে ছিলাম। মানে আমি বুঝতেই পারিনি যে এতটা রাত হয়ে গেছে। বিকেলের দিকে এসেছি। হাঁটতে হাঁটতে চরের শেষ মাথায় চলে গেছি। ওপাশের পদ্মা বিশাল। এপার ওপার দেখা যায় না। কতক্ষণ যে সেই অকূল নদীর দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম।। হঠাৎই দেখি বিশাল চাঁদ উঠেছে আকাশে। সেদিন পূর্ণিমা। চাঁদের আলোয় কী যে আশ্চর্য সুন্দর হয়েছে চর! চাঁদের আলোয় ঝকমক ঝকমক করছে চরের বালি। নদীর হাওয়ায় হা হু করছে কাঁশবন। হাঁটতে হাঁটতে সেই কুঁড়েঘরটার সামনে চলে আসি। ঘরটার তিনদিকে কাঁশবন, সামনের দিকটায় সাদা বালি, যেন বিশাল একখানা উঠোন। ঘরটার কাছে এসে আমার যে কী হলো, বালির ওপর হাত দিয়ে পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়লাম। চাঁদের দিকে তাকিয়ে শুয়ে আছি তো আছিই। আমার আর নড়তে ইচ্ছে করে না। উঠতে ইচ্ছে করে না। বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে করে না। মনে হয় অনন্তকাল ধরে এই জায়গায়টায় আমি শুয়ে থাকি। এই নির্জনে চাঁদের আলো নদীর হাওয়া আর ছোট্ট একটা কুঁড়েঘর, আমি এই পৃথিবীর একমাত্র বাসিন্দা।

শুভর কথা শুনতে শুনতে মৌর মধ্যেও যেন তৈরি হয়েছে একঘোর। সেই ঘোরলাগা গলায় সে বলল, আমাকে একদিন নিয়ে যাবেন ওই চরে? ওরকম নির্জন নদীচর যেদিন ভেসে যাবে চাঁদের আলোয়। দূর থেকে ভেসে আসবে অন্য এক নদীর হাওয়া। সেই হাওয়ায় হা হা করবে কাঁশবন। আপনার সঙ্গে বিকেলবেলা এই নদী পার হব আমি। তারপর দুজনে চলে যাবো চরের ওপারকার নদীতীরে। সন্ধ্যা হতে না হতেই সেদিন চাঁদ উঠবে। আমরা দুজন হাঁটতে হাঁটতে ফিরে আসবো সেই কুঁড়েঘরটার সামনে। তারপর, তারপর সেই সন্ধ্যাটা কুঁড়েঘরটির সামনের বালিয়াড়িতে পাশাপাশি শুয়ে থাকবো আমরা দুজন। নিয়ে যাবেন? আমাকে আপনি নিয়ে যাবেন?

শুভ মন্ত্রমুগ্ধের গলায় বলল, নিয়ে যাব।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG